এপ্রিল ২০১৮ - চৈত্র ১৪২৪-বৈশাখ ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

পহেলা বৈশাখ বাঙালির আত্মদলিল

স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার

নবরূপে বৈশাখ নবশক্তির বিকাশ

গ্রামবাংলার বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন, কিনুন ও লেখা পাঠান

লেখা পাঠাতে ই-মেইল করুন
email : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com

- গ্রাহকগণের যোগাযোগের সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- বছরের যে-কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। নগদে বা মানিঅর্ডারে গ্রাহকমূল্য পাওয়ার পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি প্রতি মাসে ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- ক্রয়, এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

নবারুণ

নিয়মিত পড়ুন, কিনুন,
লেখা ও মতামত পাঠান।
এখন মোবাইল অ্যাপে
পাওয়া যাচ্ছে।

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : editornobarun@dfp.gov.bd

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৩১১৪২
এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com ■ নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd ■ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
Website: www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 38, No. 10, April 2018, Tk. 25.00

বাংলাদেশের বিভিন্ন লোকজ মেলা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

এপ্রিল ২০১৮ ❑ চৈত্র ১৪২৪-বৈশাখ ১৪২৫

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

সম্পাদকীয়

বছর ঘুরে আবারো এসেছে পহেলা বৈশাখ। বাঙালির প্রাণের, ঐতিহ্যের, চিরায়ত সংস্কৃতির সর্বজনীন উৎসব পহেলা বৈশাখ। উৎসবে, মেলায়, শোভাযাত্রায় নানা আয়োজনের মধ্যে আনন্দঘন পরিবেশে সারাদেশে বরণ করা হবে নতুন বঙ্গাব্দকে। স্বাগত ১৪২৫ বঙ্গাব্দ। সম্প্রতি বিশ্ব মানচিত্রে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৪৩ বছর পর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি বিদায়ী ১৪২৪ বঙ্গাব্দকে স্মরণীয় করে রাখবে। জাতীয় জীবনে এই অর্জনের আনন্দের রেশ থাকতে থাকতেই এল বাংলা নববর্ষ। একটি উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক হিসেবে শুরু হলো এদেশে ষোলো কোটি মানুষের গর্বিত পথচলা। একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার দৃপ্ত শপথে প্রেরণা হয়ে উঠুক এবারের বাংলা নববর্ষ, পহেলা বৈশাখ। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পাঠকসহ সকলের প্রতি বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে একাধিক নিবন্ধ রয়েছে এবারের সংখ্যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। একাত্তরের এদিনে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের এই অস্থায়ী সরকার মুজিবনগর সরকার নামে বহুল পরিচিত। ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ প্রণীত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী এ সরকার গঠন করা হয়। ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে এ সংখ্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রচিত একাধিক নিবন্ধ রয়েছে।

এছাড়া ২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস, ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এবং বিশ্বনন্দিত প্রয়াত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং স্মরণে নিবন্ধসহ এবারের *সচিত্র বাংলাদেশে* স্থান পেয়েছে গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিষয়। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

DFP

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন
সুফিয়া বেগম

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
সৈয়দ মাসুদ হোসেন
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
dfpsb1@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক**
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ
স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার ৪
এইচ টি ইমাম
রমনা বটমূলে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ৫১ বছর ৬
কামাল লোহানী
বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ ৮
শামসুজ্জামান খান
পহেলা বৈশাখ বাঙালির আত্মদলিল ৯
হায়াৎ মামুদ
নানা রঙের বৈশাখি মেলা ১১
আবুল আহসান চৌধুরী
আসুন আমরাও বদলাই ১৩
মোনায়েম সরকার
নবরূপে বৈশাখ নবশক্তির বিকাশ ১৫
মফিদুল হক
১৭ই এপ্রিল: ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় ১৭
বাহালুল মজনুন
মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশের স্বর্ণদুয়ার ১৯
আসাদুজ্জামান চৌধুরী
গ্রামবাংলার বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য ২১
শামসুজ্জামান শামস
মুজিবনগর বাংলাদেশের আদর্শ ও চেতনা ২৫
রফিকুর রশীদ
উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ ২৬
শ্যামল দত্ত
সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ২৮
বীরেন মুখার্জী
বৈশাখের আনন্দ কাব্য ২৯
জাকির আবু জাফর
২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম জনসচেতনতা দিবস: ৩০
প্রয়োজন অটিজম সচেতনতা
আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা
প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ৩৩
মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান
ফিচার
৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস: ৩৪
গুলেনব্যারি সিনড্রোম
রাবেয়া ফেরদৌস
৩রা এপ্রিল: জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ৩৫
লতা খান
মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ৩৬
মো. শাহেদুল ইসলাম

হাইলাইটস

চলে গেলেন স্টিফেন হকিং ৩৭
শারমিন সুলতানা শান্তা
নেপালে বিমান দুর্ঘটনা: আমরা শোকাহত ৩৮
জান্নাতে রোজী
গল্প
হারানো সুখ ৪০
জসীম আল ফাহিম
এক সন্ধ্যার গল্প ৪৪
দেলোয়ার হোসেন
কবিতাগুচ্ছ
মোশাররফ হোসেন ভূঞা, শাফিকুর রাহী, সালমা নাসরীন, সোহরাব পাশা ১৬
আমিরুল হক, মনসুর জোয়ারদার, সুহৃদ সরকার, জাকির হোসেন চৌধুরী, শাহীন রেজা ৩৯
নূরুল হক, শাহনেওয়াজ চৌধুরী, সাঈদ তপু, কবির আহমেদ, মোহাম্মাদ ইলইয়াছ, খান চমন-ই-এলাহি ৪২
বাবুল তালুকদার, মিলি হক, রুস্তম আলী, অসিত কুমার মন্ডল, আবুল হোসেন আজাদ, তাহমিনা বেগম ৪৩
মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ, খাইরুল ইসলাম তাজ, রুহুল গনি জ্যোতি, মিয়াজান কবীর, নাফ্হাতুল জান্নাত, জাকির হাসান ৪৬
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৮
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৯
আমাদের স্বাধীনতা ৫১
জাতীয় ঘটনা ৫১
আন্তর্জাতিক ৫৩
উন্নয়ন ৫৩
জেন্ডার ও নারী ৫৪
শিক্ষা ৫৫
প্রতিবন্ধী ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৫৮
কৃষি ৫৮
যোগাযোগ ৫৯
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৬০
নিরাপদ সড়ক ৬০
মাদক প্রতিরোধ ৬১
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
সংস্কৃতি ৬২
শিল্প-বাণিজ্য ৬৩
চলচ্চিত্র ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার

বাঙালি জাতির জীবনে ১৭ই এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা একটি মাইলফলক। রক্তঝরা ১৯৭১ সালের এই দিনে মেহেরপুরের ভবেরপাড়ার (বৈদ্যনাথতলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি ১২৭ জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণা মোতাবেক বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্য। বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এই নতুন রাষ্ট্র এবং তার সরকার, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম-এর বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৪

রমনা বটমূলে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ৫১ বছর

এ বছর পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বাঙালির নববর্ষ আয়োজনের ৫১ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নির্মাণের মাধ্যমে রাজনৈতিক যুদ্ধের ভিত গড়তে সংস্কৃতিকর্মীরা বিশেষ করে 'ছায়ানট' এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। ১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু করে ছায়ানট। এ সময়ে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বিস্ময়কর সব পরিবর্তন ঘটে গেছে। সারা বিশ্বে সৃজনশীল, উদ্যমী ও দ্রুত উন্নয়নশীল একটি জাতি হিসেবে আমাদের ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। বিশ্বজুড়ে বাঙালি তাদের নববর্ষ পালন করছে। এ নিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক কামাল লোহানীর বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৬

পহেলা বৈশাখ বাঙালির আত্মদলিল

জীবন তৈরি হয় স্থান, কাল ও পাত্রের চালচিত্রে। আর জীবন এক জায়গায় থেমে থাকে না; সমাজের মানুষ জ্ঞাতসারে কী অজ্ঞাতে পালটাতে-পালটাতেই এগিয়ে যায়। কালস্রোতে মানুষের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হয়, সামাজিক আচরণ ও অভ্যাসে ভিন্নতা আসে, শিল্পের সাধনায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়, মোড়বদল ঘটে। খাদ্যের অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাস্তুনির্মাণ, ভাষা, ধর্ম, সামাজিক সংস্কার, এমনকি কুসংস্কারও এবং মনের গড়ন ও কল্পনার ধাঁচ সবই একটি জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান। কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ার কারণে উৎসব-পালাপার্বণের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। জীবনকে বাদ দিয়ে তাই সংস্কৃতির অস্তিত্ব নেই। বাঙালি সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন দেশব্যাপী সর্বজনীন উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। পহেলা বৈশাখ তাই বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে হায়াৎ মামুদের নিবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা–৯

নবরূপে বৈশাখ নবশক্তির বিকাশ

বৈশাখের আছে বাইরের এক সাজ, সে সঙ্গে আছে অন্তর্জগৎ। বাইরের সাজ আমাদের নজর কাড়ে প্রবলভাবে, সেটা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদও কম নেই। কিন্তু ভেতরের তাৎপর্য থাকে অনেকটা আড়ালে। ১৯৬৭ সালে পহেলা বৈশাখ প্রভাতে রমনার পাকুড় ছায়াতলে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসহ বাঙালির চিরায়ত গান, কবিতায় বর্ষবরণ ছিল অভিনব আয়োজন, যা আলোড়িত করে জাতির চিত্ত। পহেলা বৈশাখের ভিন্নতর জাগরণী শক্তি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে পৌঁছে দিয়েছিল একাত্তরের মহান সংগ্রামের দুয়ারে। এর ওপরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের লেখা নিবন্ধটি পড়ুন, পৃষ্ঠা–১৫

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও এদেশের মানুষকে 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনী ইশতেহারে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে মধ্যম আয়ের এক সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতিকে আবার দিন বদলের স্বপ্ন দেখালেন। বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ডে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল-এর মানদণ্ড অনুযায়ী ২০১৮ সালের মার্চে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে বাংলাদেশের। এ নিয়ে শ্যামল দত্তের নিবন্ধটি দেখুন, পৃষ্ঠা–২৬

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb@yahoo.com, dfpsb1@gmail.com

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

নিবন্ধ

স্বাধীন বাংলার প্রথম সরকার

এইচ টি ইমাম

বাঙালি জাতির জীবনে ১৭ই এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা একটি মাইলফলক। রক্তঝরা ১৯৭১ সালের এই দিনে ভবেরপাড়ার (বৈদ্যনাথতলার) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি ১২৭ জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে ১০ই এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণা

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়–ফাইল ছবি

মোতাবেক বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। বিদেশি সাংবাদিকদের সাথে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় এবং অন্যান্য বিদেশি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এই নতুন রাষ্ট্র এবং তার সরকার, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এর আগে আরো দুটো ঘটনা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এবং ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা। সেইসাথে ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণ ও নির্বিচার গণহত্যা।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য– স্বাধীনতার ঘোষণা এবং নতুন সরকার গঠনের পূর্বে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের যোগাযোগ, যা বঙ্গবন্ধু পূর্বেই ব্যবস্থা করেছিলেন। অর্থাৎ পাকিস্তানিরা আক্রমণ করলে কী কী করণীয়, যেমন: কোথায় যেতে হবে, কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি। সর্বোপরি, আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বব্যাপী তার প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য এই আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ ছিল অত্যন্ত জরুরি।

এ সকল কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয় সত্যিকার অর্থে একটি সার্থক জনযুদ্ধে যার– প্রধান প্রেরণা ছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্ব। পরবর্তীকালে নতুন সরকার পরিচালনার প্রতিটি পদে আমরা সেটি অনুধাবন করেছি।

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে, এটি সংঘটিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং দেশের মাটিতে। এর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আমাদেরই কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মী। সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়, সেসময়ে মেহেরপুরের মহকুমা কর্মকর্তা তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, (পরে ড. তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী, বীর-বিক্রম, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা); ঝিনাইদহের টগবগে তরুণ মহকুমা পুলিশ কর্মকর্তা মাহ্‌বুবউদ্দীন আহমেদ (এসপি মাহবুব নামেই সমধিক পরিচিত), বীর মুক্তিযোদ্ধা। কুষ্টিয়া-যশোর এলাকার ইপিআর কমান্ডার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী তাঁর বাহিনী নিয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেন। বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে তখন পাকিস্তানিদের আক্রমণ মোকাবিলা করে স্বাধীন বাংলার নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল কঠিন কাজ। সম্ভাব্য বিমান হামলার মুখে স্থান নির্বাচন ছিল সুচতুর কৌশল। এ বিষয়ে ভারতীয় সরকারের সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবনগর দিবস আরেকটি বিষয়ের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে মুক্তিবাহিনী (তখনও সুগঠিত হয়নি) কর্তৃক গার্ড অব অনার প্রদান, যার নেতৃত্ব দেন মাহ্‌বুব। আর অনার গার্ডের সদস্যরা ছিলেন পুলিশ ও আনসারবাহিনীর কতিপয় সদস্য। তাঁদের অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। তাঁদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। গার্ড অব অনারের এই দৃশ্য আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা পৃথিবী অবলোকন করে। বাংলার মুক্তিপাগল তরুণদের তথা সমগ্র জনগণকে করে অনুপ্রাণিত।

মুজিবনগর শুধু একটি স্থান নয়, এটি হয়ে ওঠে একটি প্রতীক। সরকার যুদ্ধকালে যেখানেই গেছেন (দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্বাধীন অঞ্চলে, যেমন: রৌমারী, বেলোনিয়া ইত্যাদি) সেটিই হয়ে ওঠে মুজিবনগর। এর একমাত্র কারণ, একটি অবিস্মরণীয় নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিইতো এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে। দৈহিকভাবে অনুপস্থিত থেকেও তিনি ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বদা বিরাজমান, সকল প্রেরণার উৎস। তিনি ছিলেন বাংলার ঘরে ঘরে, আমাদের সকলের হৃদয়ে। তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণ সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী শিবিরে, মুক্তিবাহিনীর ছাউনিতে শোনা যেত সার্বক্ষণিকভাবে। তাঁর ভাষণে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার যে সকল নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন সেগুলো যুব শিবির, প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে মোটিভেটররা অনুসরণ করতেন, কৌশল শেখাতেন গেরিলাদের।

মেহেরপুরের মুজিবনগর আজ আমাদের কাছে তীর্থস্থানের মতো। লক্ষ লক্ষ বাঙালি যান সেই পবিত্র স্থানটি দেখতে, যেখানে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর দিবস পালিত হয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়। জনতার ঢল নামে সেখানে।

সেই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনগণের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ৪৭ বছর আগে স্থানীয় যেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরকে আমরা আজ বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। যাঁরা ইতোমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের পবিত্র আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সমগ্র জাতির গৌরবের এই দিনে বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নাম মুজিবনগর বলে ঘোষণা দেন। মুজিবনগরকে তিনি বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন; মুজিবনগর হবে সরকারের প্রধান কার্যালয়। তিনি আরো জানান যে, এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা হবে। সরকার যেখানে তার কার্যালয় স্থাপন করবেন সেটিই হবে মুজিবনগর। অন্য অর্থে বঙ্গবন্ধু, সরকার এবং মুজিবনগর– এই শব্দগুলো একই সূত্রে গাঁথা।

এই প্রসঙ্গে শপথ গ্রহণের প্রেক্ষাপটটি আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত এবং পাকিস্তান গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমএনএ ও এমপিএগণ ১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্তটি 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা' (Proclamation of Independence) নামে পঠিত হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণাপত্রেই সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, সেহেতু ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকেই স্বাধীনতার ঘোষণা কার্যকর হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১০ই এপ্রিল স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। ঐ দিনই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারেরও যাত্রা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী ১১ই এপ্রিল বাংলাদেশ বেতারে মন্ত্রিসভা গঠনের ঘোষণা দেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেন। এই স্থানটির নামকরণ করা হয় 'মুজিবনগর'। ঐ অনুষ্ঠানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভাষণ প্রদান করেন যা শুধু দেশবাসীর জন্য নয়, বিশ্বকে জানিয়ে দিতে, আমরা ন্যায় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি।

যেহেতু এই সরকার মুজিবনগরে তার প্রধান দপ্তর স্থাপন করে তাই এর ব্যাপক পরিচিতি হয় 'মুজিবনগর সরকার' রূপে। স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে এই সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থাপন করা হয় প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নির্বিঘ্ন নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে। সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে কত ব্যাপক এবং সুসংগঠিত ছিল সরকারের কর্মসূচি এবং গঠন কাঠামো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার আকারে বিশাল না হলেও অত্যন্ত সুসংগঠিত ছিল। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে এই সরকার গঠন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে একদিকে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া, অন্যদিকে এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল ছাত্র-জনতা, যুবাদেরকে 'যুব শিবিরে' পাঠিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলাবাহিনী গঠন করে পাকিস্তানিদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা এবং সাথে সাথে সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য চাপ সৃষ্টি এবং আমাদের মুক্তিসংগ্রামের যথার্থতা তুলে ধরা– এ সবই ছিল এই সরকারের কৃতিত্ব। এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের বৈরী নীতি সত্ত্বেও সেখানকার জনগণ এবং বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ আমাদের পক্ষে অবস্থান নেন এবং সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। এমনটি ঘটে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপসহ অন্যান্য অঞ্চলেও।

'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামকরণেই বোঝা যায় এটা প্রজাতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসংবাদিত নেতা। কর্নেল ওসমানী সশস্ত্রবাহিনী প্রধান নিযুক্ত হন ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১-এ। অধিকন্তু তাঁকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়। এত ছোটো আকৃতির মন্ত্রিসভা এবং সরকারি দপ্তর নিয়ে সরকারের কাজকর্ম চালানো এবং রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার অনুপ্রেরণা ছিল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, ৭ই মার্চের অবিস্মরণীয় ভাষণ এবং বাংলার আপামর জনগণের স্বাধীনতার চেতনা, যেটি বঙ্গবন্ধু বপন করেছিলেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে যেভাবে রাষ্ট্রের শাসনকাজ পরিচালিত হয়ে থাকে তা থেকে যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থায় দুটো বিষয়ে ব্যত্যয় করা হলো– এক. অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রতিটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থিত থেকে সভাপতিত্ব করতেন, দুই. যেহেতু অধিকাংশ বৈঠকে প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধ পরিচালনার বিষয়সমূহ মুখ্য আলোচ্য বিষয় থাকত, তাই কর্নেল ওসমানী প্রায় প্রত্যেক বৈঠকেই যোগদান করতেন।

মূলত প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই সরকারের কাজকর্ম পরিচালিত হতো। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিল প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, শ্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা। খন্দকার মোশতাক আহমেদকে দেওয়া হয় পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদীয় বিষয়। ক্যাপটেন এম মনসুর আলীর ওপর দায়িত্ব ছিল অর্থ, জাতীয় রাজস্ব, বাণিজ্য ও শিল্প এবং পরিবহণ। এ এইচ এম কামারুজ্জামান ছিলেন স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অপর তিন মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি– এঁরাই ছিলেন সরকার পরিচালনায়। নীতি নির্ধারণের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল তাঁদের। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার নির্দেশনায় আমরা, অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিববৃন্দ সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতাম। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধান সেনাপতি মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে। তাঁকে সহায়তা করতেন উপপ্রধান দুজন– অব. কর্নেল রব (এমএনএ) এবং গ্রুপ ক্যাপটেন এ কে খন্দকার।

যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি এই সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে, যার দায়িত্ব ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের গৃহহীন এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চের অনেক আগে থেকেই তাঁর সহকর্মীদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের একটি রূপরেখা দেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নই ছিল সরকারের প্রধানতম লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে যে মুক্তিসংগ্রামের ডাক দেন এবং যে সোনার বাংলার স্বপ্ন তাঁর অনুসারীদের প্রায়ই বলতেন তারই আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিকল্পনা কমিশন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল জনগণের মুক্তি এবং সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিবেদিত। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুনিপুণভাবে বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফলতম প্রধানমন্ত্রী।

লেখক: সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা

রমনা বটমূলে নববর্ষ উদ্‌যাপনের ৫১ বছর

কামাল লোহানী

এ বছর পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বাঙালির নববর্ষ আয়োজনের ৫১ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এই ৫১ বছরে আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে বিস্ময়কর সব পরিবর্তন ঘটে গেছে। ইতিহাসের পরম্পরায় ৫১ বছর মোটেই দীর্ঘ সময় নয়। এই অল্প পরিসরেই আমরা বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তি তৈরি করেছি, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জন করেছি, মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী অবকাঠামো ও উপরিকাঠামো নির্মাণ করেছি এবং সারাবিশ্বে সৃজনশীল, উদ্যমী ও দ্রুত উন্নয়নশীল একটি জাতির পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। বিশ্বজুড়ে বাঙালি তাদের নববর্ষ পালন করে থাকে। কখনো কখনো মনে হয় সারাবিশ্বেই রয়েছে আমাদের খণ্ড খণ্ড বাংলাদেশ। প্রবাসী বাঙালির স্বদেশপ্রীতি, বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ ও তার প্রসারে যেমন আন্তরিক হতে দেখি তা আমাদের সবাইকেই আশান্বিত করে। বিশ্বব্যাপী লাল-সবুজের এই অস্তিত্ব আমাদের নিঃসন্দেহে গৌরবান্বিত করে।

বাঙালির এই উন্নয়ন বিনা চ্যালেঞ্জে ঘটেনি। পাকিস্তানি ভাবধারায় পেছনমুখো শক্তিগুলোকে পায়ে দলেই বাঙালিকে এগোতে হয়েছে। আজও সেই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটেনি। বরং বিভক্ত, বিভ্রান্ত, জটিল এ বিশ্বের নষ্ট অনেক প্রবণতাকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে আমাদের বহু কষ্টের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্জনকে প্রশ্নবিদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে এই অপশক্তিগুলো সদা তৎপর রয়েছে। আমাদের তরুণসমাজকে অন্ধকারের হাতছানি দিচ্ছে। আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের মৌল স্বপ্নসৌধকে তছনছ করে দেওয়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

এমনই এক পরিপ্রেক্ষিতে এবার আমরা রমনা বটমূলে বাংলা নববর্ষের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক এই অভিযাত্রার পেছনের সংগ্রাম ও সহমর্মিতার কথা আজকের প্রজন্ম খুব সামান্যই জানে। তাই মোটা দাগে এর প্রেক্ষিত ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

সাম্প্রদায়িকতার আবরণে পূর্ব বাংলার বঞ্চিত, অবহেলিত কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন ও মধ্যবিত্তের বিপুলসংখ্যক মানুষকে মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদানের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রের পক্ষে গণভোট দিতে উৎসাহিত করা হয়। উপমহাদেশ বিভক্তির ফসল পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্মের পর পরই পূর্ব বাংলার ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের বড়ো অংশ পাকিস্তানি এলিটদের এ ষড়যন্ত্র ধরে ফেলে। বিশেষ করে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আক্রমণ শুরু হয় একেবারে দেশ বিভাগের পর পরই। এই আক্রমণ অবশ্য বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেননি সেদিনের ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অজুহাতে সেদিনের সক্রিয় ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। এই আন্দোলনের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে। বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির মান-মর্যাদা বজায় রাখতে শাহাদত বরণ করেন এক দল তরুণ। আর এভাবেই বাঙালি জাতিসত্তার বীজ বপন করে এ দেশের তরুণ সম্প্রদায়। এরপর বাঙালির প্রাণের দাবি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে সামরিকবাহিনীর ক্ষমতা দখল ও মিলিটারি-সিভিল আমলাদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ব বাংলাকে তার ন্যায্য রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। এর বিপরীতে বাঙালির প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে জেল-জুলুম সহ্য করে আবির্ভূত হতে থাকেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফা পেশ করার আগে ব্যাপকভাবে বাঙালির দুঃখের কথা বলতে গিয়ে জেল-জুলুম সহ্য করেন। বাঙালি সংস্কৃতির মূল পাটাতন তৈরি করেছেন যেসব কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী তিনি তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁদের ভাবাদর্শ ধারণ করতেন। এভাবেই বাঙালি জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রাজনীতি ও সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে বিকশিত হতে থাকে।

এরই এক পর্যায়ে এল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালনের বছর ১৯৬১ সাল। যথারীতি রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে পাকিস্তান সরকার অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এর প্রতিবাদে গণমুখী আঙ্গিকে সুর ও সংগীতকে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে সন্‌জীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক, মোখলেসুর রহমান (সিধু ভাই), আহমেদুর রহমান (ভিমরুল) সহ আরো অনেকেই সম্মিলিত উদ্যোগ নেন এবং বাঙালির ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত ছায়ানট সংগঠকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক, হাইকোর্টের বিচারপতি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক গুণিজনরা ঐক্যবদ্ধভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে এগিয়ে আসেন। বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন নির্মাণের রাজনৈতিক যুদ্ধের ভিত গড়তে সংস্কৃতিকর্মী, বিশেষ করে 'ছায়ানট' সংগঠক ও কর্মীদের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আজকের তরুণ প্রজন্মকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। সুর দিয়ে মানুষের মনের গভীরতর স্বপ্নকে প্রভাবিত করার এ প্রচেষ্টাকে আরো সক্রিয় করার অভিপ্রায়েই ১৯৬৭ সালে রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেন ছায়ানট সংগঠকরা। প্রয়াত ড. নওয়াজেশ আহমদ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী একজন বিজ্ঞানী। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে এক স্মারক বক্তৃতায় (২০০৭) তিনি বলেছিলেন কীভাবে রমনা বটমূলের পহেলা বৈশাখের সূত্রপাত হয়। তিনি বলেছেন, '১৯৬৭ সালে ওয়াহিদুল ও সন্‌জীদা আমাকে বলল, 'এবার আমরা বাংলা নববর্ষ বাইরে করব। তুমি একটা গাছ দেখ।' আমার ওপর ভার দিল ওয়াহিদুল। আমি ওয়াহিদুলকে রমনা বটমূলের কথা বললাম। রমনা বটমূলে আজ যেখানে অনুষ্ঠান হয় সেটা আসলে বট নয়, অশ্বত্থ। আমরা বট বলেই চালিয়ে দিয়েছিলাম। জায়গাটা এখন যেমন, তখন তেমনটা ছিল না। চারদিকে শুধু জঙ্গল আর ঘাসে ভর্তি। তবু আমি ওয়াহিদুলকে বললাম জায়গাটা কিন্তু খুব শান্ত, কোলাহলমুক্ত। ছায়ানটের ছেলেমেয়েদের ভালোই লাগবে। ও রাজি হয়ে গেল। সারারাত আলো জ্বেলে ছায়ানটের কর্মীরা সেই ঘাস কাটল, জঙ্গল পরিষ্কার করল। এভাবেই ছায়ানটের বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন শুরু হলো। আজ এই অনুষ্ঠান যে জাতীয় পর্যায়ে চলে গেছে তাতে আমার খুব ভালো লাগে।' [আতিউর রহমান, রবীন্দ্রসাধক ওয়াহিদুল হক, দীপ্তি প্রকাশনী ২০১১, পৃ. ৩১১]।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্বরূপ চেতনার যে সংকট চলছিল, মুসলমান না বাঙালি– এই দ্বিধা ঘোচানোর ব্রত নিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির মূলধারার সন্ধান দিয়েছে ছায়ানট। একই সঙ্গে প্রবহমান বাঙালি ঐতিহ্যের চর্চা করে চলেছে ছায়ানট। সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে জাগ্রত করে যাচ্ছে বাঙালির হৃদয়। আজও পুরোপুরি সক্রিয় ছায়ানট। ছায়ানটের সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের মৌল নীতি তথা বাঙালি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ক্রমেই মানুষকে টানছে এবং রাজনীতিতে ফেলছে বড়ো মাপের প্রভাব।

১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে এই অনুষ্ঠানের সূচনা ছায়ানটকে বৃহত্তর জনসমক্ষে আনতে সাহায্য করেছে। একথা তো সত্যি, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সংস্কৃতিকে হিমালয়ের মতো রক্ষা করে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বলে এসেছেন, 'রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে হলে এর ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে সমাজে, সংস্কৃতিতে।' তাই বাঙালির উৎসবগুলোর পুনরুজ্জীবনের পক্ষে ছিলেন তিনি। গ্রামীণ মেলাগুলো পরিচালনা করতে তিনিই বলেছেন। এর ফলে বাঙালির সামাজিক বন্ধন পোক্ত হবে বলে তিনি মনে করতেন। সেই অভিপ্রায়েই ছায়ানট বাঙালির নিজস্ব 'শুভ নববর্ষ' উদ্‌যাপনের এই আয়োজনের সূত্রপাত করে। বলা যায়, ছায়ানট রবীন্দ্রনাথের সেই জাগরণের অগ্রগামী এক প্রতিষ্ঠানের নাম। এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনের ভাবনাটির কথা সন্‌জীদা খাতুন এভাবে জানিয়েছেন, 'আমরা একসময় 'শ্রোতার আসর' নামে একটা অনুষ্ঠান করতাম। গান শুনিয়ে আমরা 'অতীতচারী' করতে চাইতাম। সেসব গান বাঙালির বলে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখা গেল, আমাদের দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। কারণ শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তখন শুধু ওই বুলবুল একাডেমি ছিল। সেই জন্য আমরা একটা স্কুল করা দরকার বলে মনে করতাম। ...গান মানুষের জীবনে সংস্কৃতির বড়ো একটা ছাপ ফেলে।' [আতিউর রহমান, *রবীন্দ্রসাধক ওয়াহিদুল হক*, দীপ্তি প্রকাশনী ২০১১, পৃ. ৫৪]।

সেই ছায়ানট এখন এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া জমিতে সবার প্রচেষ্টায় এক কর্মচঞ্চল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নাম ছায়ানট। এর সঙ্গে সম্পূরক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঙালির মননকে সিক্ত করে চলেছে রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ।

এই সংস্কৃতি ভবন উদ্‌বোধনের দিন প্রয়াত ওয়াহিদুল হক বলেছিলেন, 'নগরের মানুষদের অসাম্প্রদায়িক করার আন্দোলনে ছায়ানট খানিকটা সফল হয়েছে। এবারে গ্রামের সাধারণ মানুষকেও শুদ্ধ সংস্কৃতির পরশ দিতে হবে। সবাইকে সঙ্গে নিতে পারলে সম্পূর্ণ বাঙালি হওয়া যাবে।'

সুদীর্ঘ ৫১ বছরে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রমনা বটমূলের এ নববর্ষ উদ্‌যাপন এখন সারাদেশ ও বাঙালি অধ্যুষিত বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। লাখ লাখ বাঙালি বাংলা নববর্ষে পথে নেমে পড়ে। নতুন জামাকাপড় পরে এক উজ্জ্বল সকালে তাদের আনন্দঘন উপস্থিতি বাঙালির অস্তিত্বের জানান দেয়। পাশাপাশি চারুকলা ইনস্টিটিউট থেকে বের হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের এক অসাধারণ অগ্রযাত্রার প্রতীক বাঙালির এসব আয়োজন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্প্রতি ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে আমাদের আলোর পথযাত্রাকে পুরনো সেই সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে চাইছে। কোমলমতি তরুণদের বিভ্রান্ত করে ফেলতে চাইছে। অথচ সেই কত আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজপ্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।' [রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৬৬৬]।

এমন বিভেদ ঠেকানোর একটা বড়ো উপায় হতে পারে সংগীত চর্চা। কেননা সংগীতই পারে জীবনের অসামঞ্জস্যগুলোর অবসান ঘটিয়ে এক নয়া পারসপেকটিভ দিতে। সংগীত শিল্পের এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা রবীন্দ্রনাথই তাঁর ছিন্নপত্রে বলে গেছেন।

সেই প্রেক্ষিত মনে রেখেই আমরা স্মরণ করব বাঙালির ৫১ বছর ধরে সাহসের সঙ্গে স্বকীয় সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার এই অবিস্মরণীয় কাহিনি। এ বটমূলেই নিক্ষিপ্ত হয় বিধ্বংসী বোমা। সেদিন মাত্র কয়েক মিনিট আগে ঠিক ওই জায়গাতেই আমি সস্ত্রীক দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাড়া ছিল বলে বের হয়ে এসেছিলাম সেখান থেকে। কিন্তু সেদিন ওই আক্রমণে হারিয়েছি আমরা বেশকিছু তাজা প্রাণ। শুধু কি তাই? আমাদের মুক্ত সংস্কৃতি চর্চাকে করেছে নানা প্রতিবন্ধকতাযুক্ত।

কিন্তু তাই বলে সংস্কৃতিকর্মীরা বসে নেই। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা সম্মুখপানে। রাষ্ট্র যদি সুবিধাবাদী আচরণ না করে, শিক্ষায় যদি অসাম্প্রদায়িক চেতনাবিরোধী হস্তক্ষেপ না করে, সমাজ যদি সর্বদাই সচেষ্ট থাকে, মুক্তিযুদ্ধের মৌল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে, তাহলে নিশ্চয় বাংলাদেশ ও বাঙালি সংস্কৃতির এগিয়ে যাওয়াকে কেউ রুখতে পারবে না। অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক– সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

লেখক: সাংবাদিক, কলামিস্ট ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক

বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ

শামসুজ্জামান খান

বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ আমাদের জাতীয় উৎসব। আমাদের আরো উৎসব আছে। এ কিছু ধর্মীয় উৎসব আর কতক ঋতু উৎসব। আবার একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের মাতৃভাষার উৎসব। সে উৎসব রাজনৈতিকও বটে। আমাদের তরুণেরা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এই উৎসবের সৃষ্টি করেছেন। বাংলা নববর্ষ উৎসব আর একুশে ফেব্রুয়ারি তাই বাংলাদেশের সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের মহান উৎসব।

আজ আমরা আমাদের সব উৎসবের কথা বলব না। শুধু নববর্ষ উৎসবের কথা বলব। বাংলা নববর্ষ উৎসব কখন, কীভাবে শুরু হয়েছে তা ঠিক ঠিক বলা কঠিন। ইতিহাসেও তেমনভাবে কিছু নেই। তবে প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামীণ বাংলাদেশে 'আমানি' নামে একটি পারিবারিক উৎসব চালু ছিল। প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তির দিনগত রাতে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের আগের রাতে বাড়ির গৃহিণী একটি ঘটে পানি ঢেলে তাতে কচি একটি আমপাতার ডাল রেখে দিতেন। আর ঘটে কিছু আতপ চাল ছেড়ে দেওয়া হতো। পহেলা বৈশাখের সকালে সেই আমপাতার ডালটি ঘটের পানিতে ডুবিয়ে সেই পানি বাড়ির সকলের শরীরে ছিটিয়ে দেওয়া হতো। আর ঘটে ভেজানো চাল বাড়ির সবাইকে খেতে দেওয়া হতো। লোকবিশ্বাস ছিল– এতে সারাবছর সকলের মঙ্গল হবে। গৃহকর্তা এই ভেজা চাল খেয়ে ক্ষেতে হালচাষ করতে যেতেন। মনে করা হতো, এতে ফসলের কোনো অমঙ্গল হবে না। এই বিষয়টি পরবর্তীকালে বাংলা নববর্ষের উৎসবের একটি অংশ হয়ে যায়।

আরেকটি বড়ো ব্যাপার ছিল মেলা। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চৈত্রসংক্রান্তির দিনে এবং পহেলা বৈশাখ সকালে মেলা বসত। এই মেলার খুব প্রয়োজন ছিল। কারণ কৃষিভিত্তিক বাংলায় মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা ছিল না। আর কাছেপিঠে এখনকার মতো এত দোকানপাটও ছিল না। তাই চটজলদি প্রয়োজনের জিনিসটি কিনে এনে ব্যবহার করাও ছিল কঠিন। তাই প্রতিবছরের এই মেলা থেকেই গ্রামের মানুষ হাঁড়িকুড়ি, দা-কাঁচি থেকে শুরু করে সংসারের সারাবছরের যাবতীয় দ্রব্য বা তৈজসপত্র কিনে রাখত।

এই ছিল গ্রামীণ মেলার আদি উপায়-উপকরণ। আরো পরে ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারি প্রথা চালু করা হয়। জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য বছরের প্রথম দিনে তাদের বাড়িতে 'পুণ্যাহ' উৎসব করতেন। সেই উৎসবে চাষি-প্রজারা জমিদারির খাজনা পরিশোধ করত এবং মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত হতো। তখন কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে। অতত্রব দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস দোকানিরা বেচাবিক্রিও করতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের হাতে তো নগদ পয়সা ছিল না। তাই তারা বাকিতে দোকান থেকে জিনিস কিনত। কিন্তু এই যে ধারে কেনা জিনিস, এই ধার তো শোধ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা তাই বছরের প্রথম দিনে হালখাতা করতেন। সেই হালখাতার দিনে ক্রেতারা দোকানির দেনা পরিশোধ করে মিষ্টিমুখ করে যেতেন। দোকানিরা তাদের দোকান সাজাতেন নানান রঙিন কাগজের ঝালর বানিয়ে আর আগরবাতি-ধূপধুনো জ্বালিয়ে। একটা ছিমছাম, ছাপছুতরো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে ক্রেতা-বিক্রেতার এই সম্মেলন বেশ আনন্দপূর্ণই হতো।

এই চারটি উপাদান ছিল প্রাচীন বাঙালির পহেলা বৈশাখের মূল অঙ্গ। পরে ইতিহাস এগিয়েছে। মোগল বাদশাহরা দিল্লিতে চালু করলেন ইরানের নববর্ষ উৎসব 'নওরোজ'-এর অনুকরণে উৎসব ও মীনা বাজার। সেও ছিল রাজরাজড়া, অভিজাত ধনী বণিকদের নববর্ষের উৎসব। বাংলা নববর্ষ সেখান থেকেও পেয়েছে। এরও পরে ইংরেজ আমলে এসে কলকাতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে ইংরেজদের নববর্ষ উদযাপনের আদলে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের রীতি চালু হয়। ১৮৯৪ সালে বেশ ঘটা করেই ঠাকুর পরিবারে নববর্ষ উদযাপিত হয়। সেই থেকে নগরবাসী শিক্ষিত পরিবারে কলকাতা শহর এবং শান্তিনিকেতনসহ পশ্চিম বাংলার নানা শহরে নববর্ষ উদযাপনের রীতি চালু হয়।

বাংলাদেশে এই আধুনিক ধারার নববর্ষ চালু হয়েছে ১৯৫১-এর দশকের প্রথম দিকে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন। সেই সময় থেকে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে নববর্ষ উৎসব চালু হয়। ঢাকার মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের উদ্যোগে কার্জন হলে নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। তখন ঐকতানসহ কয়েকটি সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এবং ওয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিটেও এই উৎসবের সূচনা করে। তবে বর্তমানে ঢাকা শহরে নববর্ষের উৎসব যে বর্ণাঢ্য অবয়ব, নব আঙ্গিক ও বিপুল আয়তনে প্রচলিত হয়েছে, তার ইতিহাস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের এই জাতীয় উৎসবটি পাকিস্তান সরকার করতে দিতে চাইত না। এই বাধার মুখেই বাঙালি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

পূর্ব বাংলার বাঙালি তার শিকড় অনুসন্ধান করে নতুনভাবে সাজায় বাংলা নববর্ষের উৎসবকে। এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 'ছায়ানট' (১৯৬১)-এর। ছায়ানট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি রমনার বটমূলে ১৯৬৭ সাল থেকে চালু করে নববর্ষের এই উৎসব। এই উৎসব বাঙালির জাতিসত্তার সঙ্গে যুক্ত বলেই অতি দ্রুত তা জনপ্রিয় হয় এবং প্রতিবছরই বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের উৎসব হয়ে ওঠে। নানা ডিজাইনের রং-বেরঙের পাঞ্জাবি-পায়জামা-শাড়িতে সজ্জিত বাঙালি পুরুষ-নারীর বিপুল সমাগমে এই উৎসব এখন বাঙালির সর্ববৃহৎ জাতীয় অনুষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। এই উৎসব একসময় গ্রাম থেকে গ্রামে শুরু হয়েছিল কিন্তু পরে আর খুব বড়ো আকার গ্রহণ করেনি। এখন এই উৎসব গ্রাম থেকে বর্ণাঢ্য সাজে সজ্জিত হয়ে রাজধানী ছাড়িয়ে বিভাগ, বিভাগ ছাড়িয়ে জেলা, জেলা ছাড়িয়ে উপজেলা এবং গ্রাম পর্যন্ত নব আঙ্গিকে এবং নব সাজে চালু হয়ে গেছে। এই উৎসব বাঙালি জীবনে যে আনন্দ বয়ে আনে, তার তুলনা বিরল।

লেখক: ফোকলোর বিশারদ ও মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

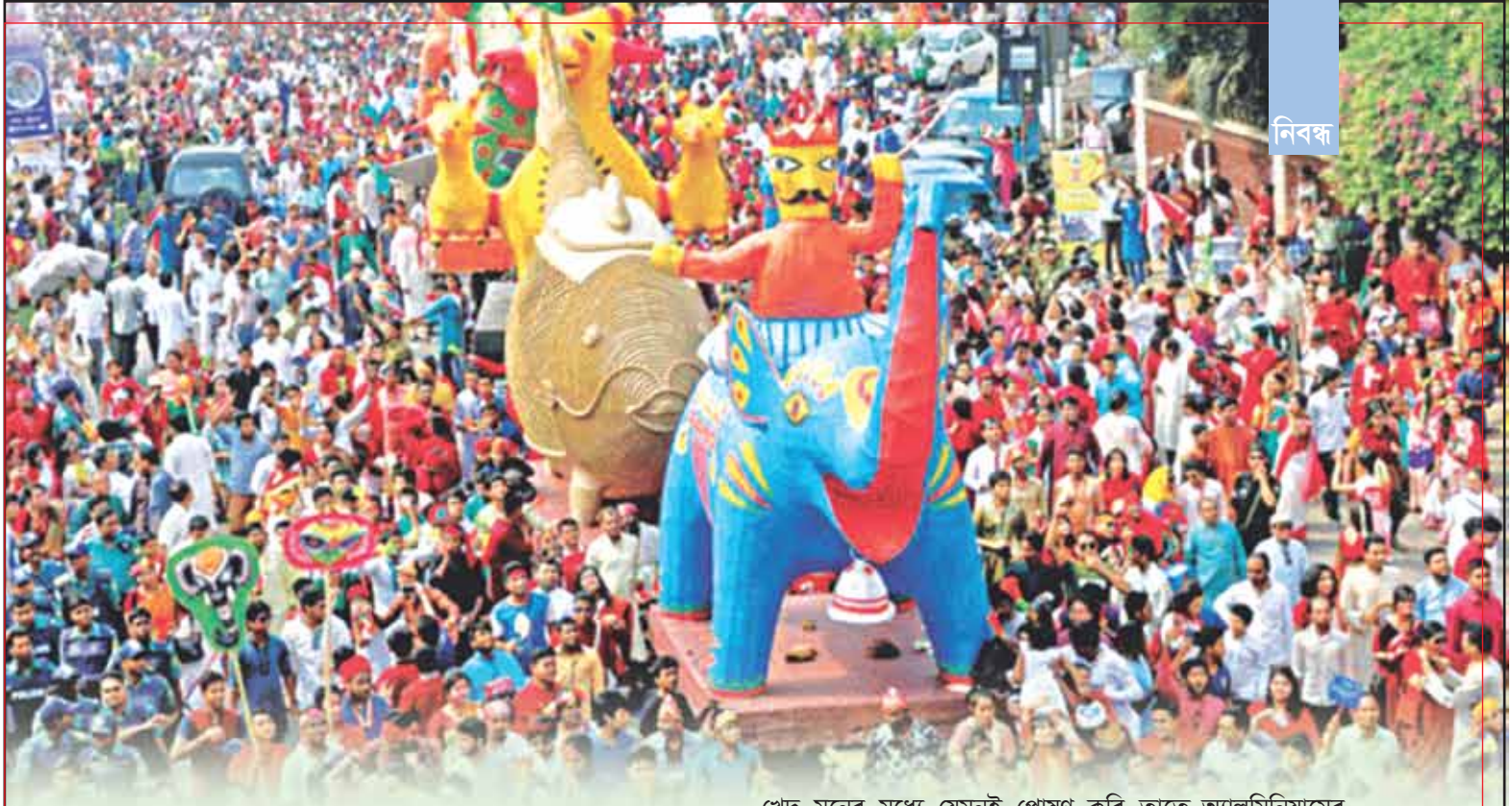

পহেলা বৈশাখ বাঙালির আত্মদলিল

হায়াৎ মামুদ

জীবন তৈরি হয় স্থান, কাল ও পাত্রের চালচিত্রে। আর জীবন এক জায়গায় থেমে থাকে না; সমাজের মানুষ জ্ঞাতসারে কী অজ্ঞাতে পালটাতে পালটাতেই এগিয়ে যায়। কালস্রোতে মানুষের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হয়, সামাজিক আচরণ ও অভ্যাসে ভিন্নতা আসে, শিল্পের সাধনায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়, মোড় বদল ঘটে। খাদ্যের অভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাস্তুনির্মাণ, ভাষা, ধর্ম, সামাজিক সংস্কার, এমনকি কুসংস্কারও এবং মনের গড়ন ও কল্পনার ধাঁচ সবই একটি জাতির সাংস্কৃতিক উপাদান। জীবনকে বাদ দিয়ে তাই সংস্কৃতির অস্তিত্ব নেই। জীবন পালটে যেতে থাকলে সংস্কৃতির রূপও অন্যরকম হতে থাকে। আর জীবন পালটায় ঘটনার অভিঘাতে।

যদি কেউ ভেবে থাকেন, সংস্কৃতির রূপ অপরিবর্তনীয় তিনি যেমন কট্টরপন্থি ছুৎমার্গের পরিচয় দেবেন; তেমনি সংস্কৃতির নিত্য পরিবর্তনশীলতাকে চূড়ান্ত বলে যিনি মানবেন, তার চিন্তায় উন্মার্গতা ও আতিশয্য প্রাবল্য পাবেই। সত্য মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে এ দুয়ের মাঝখানে। সংস্কৃতি রূপের পরিবর্তন না মেনে উপায় নেই, কারণ জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে তাতে পরিবর্তন ধীর ও সূক্ষ্ম লয়ে ঘটতেই থাকে; যেসব কারণে ঘটে তার মধ্যে মুখ্য হলো জীবনযাত্রার চলিষ্ণুজনিত পার্থক্য। যুগ থেকে যুগে কিংবা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জীবনযাপনে তফাৎ আসে অর্থনৈতিক কারণে। অর্থাৎ অর্থনীতিসঞ্জাত কর্মপ্রণোদনার ব্যাপ্তিতে বা সংকোচনে। গ্রামের ভেতরে শহরের অনুপ্রবেশ, এমনকি একে যদি 'শহুরে আগ্রাসন'ও বলি, ঘটে তো গেছেই। ইচ্ছা করে পরিকল্পনামাফিক কেউ ঘটায়নি; অবশ্যম্ভাবী বলেই তা ঘটেছে। গ্রামীণ বাংলায় পেশার রূপান্তর নিয়ে জরিপ করলে গ্রামাঞ্চলে বৃত্তিবিন্যাসের পরিবর্তন তীব্রভাবে চোখে পড়বে এবং কারণ শনাক্ত করতে গেলে দেখা যাবে পারিবারিক বৃত্তি ত্যাগ করে নতুন বৃত্তি গ্রহণের পেছনে অর্থনৈতিক নিয়মই নিয়ন্ত্রক শক্তি। কাঠের আগুনে মাটির হাঁড়িতে রান্নার স্বাদ বেশি, জ্বাল দেওয়া দুধ তো আসলেই অমৃতস্বাদী– এমন খেদ মনের মধ্যে যেমনই পোষণ করি তাতে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল-থালাবাসনের অনুপ্রবেশ রোধ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না।

এর পশ্চাৎবর্তী কারণ জিহ্বার স্বাদ পরিবর্তন নয়; আর্থিক সংগতির হিসাব-নিকাশে অধিকতর সাশ্রয়গুণ। পুরুষের পোশাকে সুতিবস্ত্রের জায়গা সিনথেটিক কাপড় যে দখল করে নিল, তার কারণও ব্যয়সংকোচ। এমনি হাজারটা প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটিতে ধরা পড়বে গ্রাম বা শহরের মানুষ ৫১ বছর আগে যেমন ছিল এখন তেমন আর নেই। কোনো মৃতের আত্মা যদি তার স্বগ্রাম পরিভ্রমণে হঠাৎ এসে হাজির হয় তাহলে সে তার আত্মীয়স্বজনের হাবভাব, চালচলন, পোশাক-আশাক অনেক কিছুই চিনে উঠতে পারবে না। সারকথা, নানাবিধ অনিবার্য কার্যকারণে মানুষের জীবনযাপন পালটাতে থাকলে তাদের মনোজগৎ পালটে যেতে থাকে এবং মনোজগৎ পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু ওই পরিবর্তন কোথায়, কতখানি এবং কেন? এই প্রশ্নাবলি সমাজের ভাবুক ও ধীমান মানুষকে বিবেচনা করতেই হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়িত্ব তাদের ওপর এসে পড়ার কারণ সমাজের যৌথচৈতন্য বা কালেক্টিভ সেনসিটিভিটির মাপজোখ করে সমাজকে উৎসাহদান বা বিপদসংকেত জানানোর ঔচিত্যবুদ্ধি ও প্রাজ্ঞতা তারা অর্জন করেছেন বলে সাধারণ মানুষ বিবেচনা করে।

কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ার কারণে উৎসব-পালা-পার্বণের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। বাঙালি সমাজও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয় এবং ব্যতিক্রম ছিলও না। এমন একটি সময়ের কথা ভাবা যাক, যখন এই জনগোষ্ঠী আচরিত ধর্মের আনুগত্যে প্রবলভাবে বাঁধা পড়েনি, তখন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখেই যাবতীয় লৌকিক উৎসবগুলো স্বতঃসারিত হয়েছিল। ধর্ম সেকালেও জীবনকে 'ধারণ' করত বটে, কিন্তু সে ধর্মের বাহ্যিক রূপ ছিল লোক সংস্কৃতিপ্রসূত, লৌকিক। অর্থাৎ বাতাবরণে ধর্ম থাকত, যদিও কর্মকাণ্ডের অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ ছিল সামাজিক প্রয়োজননির্ভর, সমাজবিজ্ঞানের কাণ্ডজ্ঞানপ্রসূত। কৃষিভিত্তিক সমাজের লোকজ ধর্মের পাশে মরু

অঞ্চলের ধর্ম ইসলাম এসে যখন স্থান করে নেয় তখন আচরিত পালা-পার্বণের মধ্যে ব্যবধান, বৈপরীত্য, সংঘাত ইত্যাদি দেখা দিতে শুরু করে। সময়ের প্রবাহে সেখানেও সংগতিসূত্র স্থাপিত হয়, নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের ভেতরে জীবনের প্রয়োজনে সহাবস্থান অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় এবং ধর্মাচারগত ব্যবধান সত্ত্বেও সহমর্মিতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় হলো, বহিরাগত ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সব সামাজিক উৎসবই ধর্মকেন্দ্রিক, ইসলাম-সমর্থিত ধর্মীয় উৎসব; সেখানে ঐতিহ্য অনুসারী লৌকিক উৎসবের কোনো স্থান ছিল না, থাকার কথাও নয়। তবে যা স্বাভাবিক তা তো ঘটতে বাধ্য। মুসলমান সমাজের ধর্মভিত্তিক উৎসবও ক্রমে স্থানীয় লোকাচারের অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা থেকে উদ্ভূত অজস্র উপাদান সাঙ্গীকরণ করে নেয়। জনসাধারণের মনোজগতেও সহিষ্ণুতা স্থায়ী আসন গাড়ে। নিজেদের অজ্ঞাতেই ধর্মনিরপেক্ষ অনুভবশক্তির উদ্ভব ঘটে। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসবও পারস্পরিক লেনদেনে-অংশগ্রহণে সর্বজনীনতার রূপ নেয়। এত কিছুর পরও যা লক্ষণীয় তা হলো– বাঙালির নববর্ষ উৎসবের ইতিহাস প্রাচীন নয়। চৈত্রসংক্রান্তির যে লৌকিক উৎসব চালু ছিল তা-ই গড়িয়ে চলে যেত পহেলা বৈশাখ অবধি। তাতে মুসলিম সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল না। সে ছিল দর্শক ও উপভোক্তার দলে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর উৎসবাবলির এই ধর্মকেন্দ্রিকতা, যতদূর মনে হয়, সচেতনভাবে প্রথম লক্ষ করেন রবীন্দ্রনাথ। তার প্রজ্ঞা ও বোধশক্তিতে প্রথম ধরা পড়ে বহুধর্মী জনগোষ্ঠীতে ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব চালু না করতে পারলে বিভিন্ন সম্প্রদায় আত্মিকভাবে যুক্ত হতে পারবে না। ততদিনে ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে একটি উপাদান হিসেবে ধর্মকে বিবেচনা করা শুরু হয়েছে এবং ধর্মভেদ নীতিতে রাজনৈতিক বিভাজন ও হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বীজ রোপিত হয়েছে– এসবও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিশ্চয়ই খুলে দিয়েছিল। কবি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে যেসব উৎসব প্রচলন করেছিলেন তার গভীরে ধর্মসম্প্রদায়গত ঐক্যবন্ধনের দর্শন কাজ করেছিল নিশ্চয়ই। নইলে বসন্ত উৎসব, হালকর্ষণ উৎসব ইত্যাদি সেক্যুলার সম্মিলনী উদ্ভাবনের কোনো কারণ ছিল না। বহুধর্মীয় সমাজে একমাত্র ধর্মভিত্তিক উৎসব কোনো ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না– তিনি জানতেন। বাংলাদেশের অপরিসীম সৌভাগ্য যে, পহেলা বৈশাখে নববর্ষ উদ্‌যাপন দেশব্যাপী সার্বজনীন উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। অন্তত বাংলা ভাষাভাষী এই ভূখণ্ডে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব হিসেবে বাংলা নববর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। পহেলা বৈশাখের আনন্দসম্মিলন সর্বাংশে স্বতঃউৎসারিত এবং বাঙালি সংস্কৃতির সর্বাত্মক পরিচয় হিসেবে এই দিনটির যাবতীয় কর্মপ্রণোদনাকে আমরা দেখতে চাইছি। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ করা যাচ্ছে, এ দিবসের উৎসবশরীরে অন্তত ঢাকা শহরে কিছু মালিন্যলিপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

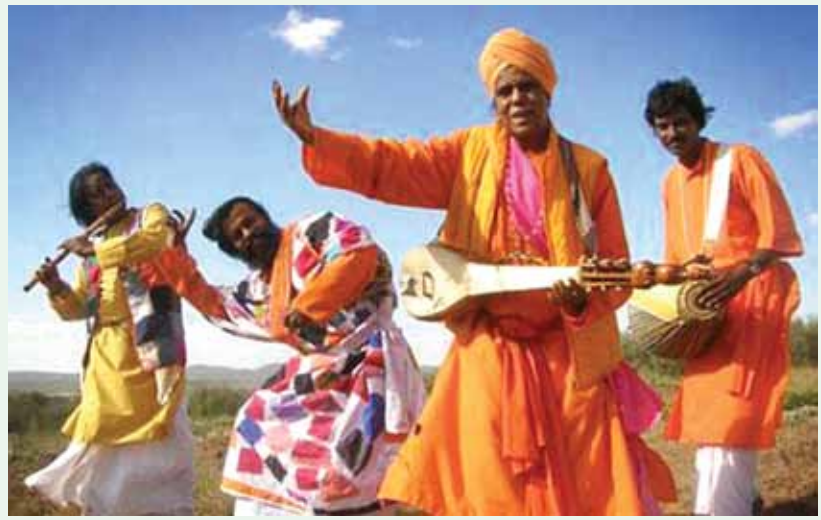

সংস্কৃতি নিজস্ব নিয়মে ধারাবাহিকতায় প্রবাহিত হয়, ঠিকই। কিন্তু স্বচ্ছ স্রোতধারায় আবিলতা নিক্ষিপ্ত হলে তাকে পরিষ্কার করে নির্মলতা ফিরিয়ে আনতে হয়। তাই সংস্কৃতিচর্চার ধারাও নিরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, কখনো বা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈকি। নববর্ষের দিনটিতে সংস্কৃতি-সাংকর্য ততটুকুই কাম্য যতটুকুতে কোনো সংঘর্ষ না লাগে।

লেখক: প্রাবন্ধিক, শিক্ষাবিদ, সাবেক অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নানা রঙের বৈশাখি মেলা

আবুল আহসান চৌধুরী

বাঙালি জীবনের সঙ্গে মেলার যোগ দীর্ঘকালের। এই সম্পর্ক নিবিড় ও আত্মিক। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির সমন্বিত অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলাতেই সার্থকভাবে প্রকাশিত। এই মেলা বা আড়ংয়ের চালচিত্রের আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি থেকে। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার বাড়ির মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়– তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন– আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা' [*আত্মশক্তি*]।

'বাংলাদেশের মেলার ঐতিহ্য বহুকালের। কিন্তু তা যে কত পুরনো, কবে এবং কীভাবে এর সৃষ্টি সেসব তথ্য অজ্ঞাত। মেলার আদিবৃত্তান্ত না জানা গেলেও ধারণা করা চলে যে ধর্মীয় উপলক্ষেই এ দেশে মেলার জন্ম। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষ। কেউ কেউ মনে করেন, গ্রামীণ মেলা ছিল জমিদারদের উদ্ভাবিত ও পরিকল্পিত। কেননা এর সাহায্যে তাঁরা রোজগার বাড়াতেন' (†`k, ৬ই এপ্রিল ১৯৯১)। জমিদারদের পাশাপাশি লৌকিক উদ্যোগের কথাও স্মরণ করতে হয়। মেলার এই সমাবেশ ও বিকিকিনির প্রাথমিক ধারণা সম্ভবত গ্রামীণ হাট থেকেই এসেছিল। সেই অর্থে হাটই মেলার আদিরূপ।

এবারে মেলার ধরন-ধারণের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক। বাংলাদেশে প্রচলিত মেলার সংখ্যা কত, তার সঠিক হিসাব পাওয়া ভার। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা যে জরিপ চালায় (১৯৮৩) তা অসম্পূর্ণ হলেও তা থেকে সাধারণভাবে বাংলাদেশের মেলার সংখ্যা, প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। আশরাফ সিদ্দিকী তার *লোকসাহিত¨* বইয়ে গ্রামীণ মেলার জেলাওয়ারি তালিকা প্রণয়ন করেছেন। *জেলা গেজেটিয়ার ও আঞ্চলিক ইতিহাস* গ্রন্থেও মেলার কিছু বিবরণ মেলে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থার জরিপে মোট মেলার সংখ্যা বলা হয়েছে ১০০৫। এসব মেলার প্রায় নব্বই ভাগই গ্রামীণ মেলা। সারাবছরই দেশের কোনো না কোনো স্থানে মেলা বসে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে। এসব মেলার স্থায়িত্ব সমান নয়। একদিন থেকে এক মাস পর্যন্ত এর স্থিতিকাল। মেলার স্থান নির্বাচনে প্রাধান্য পায় নদীর তীর, গ্রামের বট-পাকুড়াশ্রিত চত্বর কিংবা খোলা মাঠ, মঠ-মন্দিরসংলগ্ন প্রাঙ্গণ, সাধু-সন্ত-ফকির-দরবেশের সাধনপীঠ বা মাজার, প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থান বা তীর্থক্ষেত্র। কখনো স্কুল-কলেজ চত্বর বা খেলার মাঠেও মেলা বসে থাকে। মেলা মানে উৎসব, বিনোদন, বিকিকিনি আর সামাজিক মেলামেশার এক উদার ক্ষেত্র। ধর্মাশ্রিত লৌকিক মেলার বহিরঙ্গে আছে ধর্মীয় উপলক্ষ ও প্রেরণা, কিন্তু এর অস্তিত্বে মিশে আছে বিনোদন ও ব্যবসায়ের ধারা। আসলে প্রায় সব গ্রামীণ মেলার উৎস, উপলক্ষ ও প্রেরণার মূলে ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও এর চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ, আর্থ-সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ মেলাই ধর্মীয় উপলক্ষে প্রবর্তিত। হিন্দু সম্প্রদায়ের রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জন্মাষ্টমী, পৌষসংক্রান্তি, চৈত্রসংক্রান্তি, শিবরাত্রি, সাধু-সন্তের জন্ম-মৃত্যুর স্মারক দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে মেলা বসে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পালাপার্বণ ও ধর্মীয় অনুষঙ্গে প্রচলিত মেলার মধ্যে রথের মেলা সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী। বিসিকের জরিপের সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা বসে ৬২টি। এর মধ্যে প্রাচীন ও জাঁকালো রথের মেলা ঢাকার ধামরাইয়ের। এর পরেই নাম করতে হয় কুষ্টিয়ার রথের মেলার। পনেরো দিন স্থায়ী রথের মেলা বসে বাগেরহাটের লাউপালা গ্রামে।

চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নান উপলক্ষে যে মেলার আয়োজন হয়, তাও যথেষ্ট প্রাচীন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লাঙ্গলবন্দের মেলা আয়োজন ও ঐতিহ্যে সবার সেরা। শিলাইদহের স্নানযাত্রার মেলার কথাও এ প্রসঙ্গে বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এর উল্লেখ মেলে:

বসেছে আজ রথের তলায়
স্নানযাত্রার মেলা–
সকাল থেকে বাদল হল
ফুরিয়ে এল বেলা। [সুখদুঃখ, *ক্ষণিকা*]

কালীপূজার প্রাচীন মেলার মধ্যে আছে কুষ্টিয়ার খোকসার মেলা। লোকবিশ্বাস মতে, এই মেলার বয়স তিনশ বছরেরও বেশি। গড়াই নদীর তীরে কয়েক মাইল এলাকাজুড়ে মেলা বসত এক মাস ধরে। কালের প্রভাবে মেলার স্থিতি ও পরিসর দুই-ই হ্রাস পেয়েছে। এই মেলাটি আর এক কারণে বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এর সঙ্গে শিলাইদহের ঠাকুর-জমিদার ও নলডাঙ্গার রাজাদের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। দিনাজপুর, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও কুমিল্লার কালীপূজার মেলাও যথেষ্ট পুরনো। এর মধ্যে কুমিল্লার মেহের কালীবাড়ির দীপান্বিতা মেলা চলে সাত দিন ধরে।

দোলপূর্ণিমায় বসে অনেক মেলা। এই তিথি সাধুসঙ্গের সবচেয়ে বড়ো তিথি। দোলের সঙ্গে বাংলার লৌকিক সাধন-জগতের রয়েছে নিগূঢ় সম্পর্ক। এই দোলপূর্ণিমাতেই কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালনের সমাধি প্রাঙ্গণে হয় বিশাল বাউল সম্মেলন। মেহেরপুরের মালোপাড়ায় বলাহারি সম্প্রদায়ের উৎসবের তিথিও এই দোলপূর্ণিমায়। গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দিতে এই তিথিতেই অনুষ্ঠিত হয় হরিঠাকুরের স্মরণোৎসব। আর এই সব উপলক্ষ সুযোগ করে দেয় মেলা বসানোর।

চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে চড়ক পূজার মেলার ঐতিহ্যও বহুকালের। কিছু বীভৎস ব্যাপার এই মেলার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত– পিঠে বড়শি গেঁথে

চক্করদান কিংবা বাণবিদ্ধ জিহ্বা। এই দৃশ্য এখন দুর্লভ, কিন্তু বিলুপ্ত নয়। সীতাকুণ্ডের শিবমেলা একই সঙ্গে আভিজাত্য ও প্রাচীনত্বের দাবিদার। একসময় কার্তিক বারুণীর মেলারও খুব জাঁকজমক ছিল। *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় (৭ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬) বলা হয় : 'বঙ্গদেশে কার্তিক বারুণীর মেলার ন্যায় আর প্রধান মেলা নাই। ঢাকার পূর্ববর্তী মুন্সীগঞ্জের নিকটে প্রতিবর্ষে এই মেলা জমে থাকে। কার্তিক পূর্ণিমার দিন অবধি এই মেলা বিদ্যমান থাকে। এই মেলায় দেশ-বিদেশাগত লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।'

মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসবকেন্দ্রিক মেলার সংখ্যা খুবই কম। আর মুসলমানি পরব-উৎসবে প্রবর্তিত মেলা খুব একটা প্রাচীনত্বের দাবিও করতে পারে না। দুই ঈদ আর মহররম– মেলার এই হলো মুসলমানি উপলক্ষ। এই দুই উপলক্ষের মেলার সংখ্যা যথাক্রমে ১৫ ও ১৬। এর চাইতে পীর-ফকির-দরবেশের 'ওরস' মেলার আকর্ষণীয় উপলক্ষ। ঈদ উপলক্ষে প্রাচীন যে মেলার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার বয়স সাকুল্যে একশ বছরের বেশি নয়। মুনশি রহমান আলী তায়েশের *তাওয়ারিখে ঢাকার* সূত্রে জানা যায়, উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকার ধানমণ্ডির ঈদগাহে ঈদের নামাজের পর আয়োজিত হতো মেলা। অবশ্য এরপর বিশ শতকের প্রথম থেকেই ঢাকায় নিয়মিত ঈদের মেলা বসত চকবাজার আর রমনা ময়দানে। ঢাকার আজিমপুরের মহররমের মেলার দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে। এই সঙ্গে মানিকগঞ্জের গড়পাড়ার মেলার কথাও বিশেষভাবে বলতে হয়। এরপরে নাম করতে হয় কুষ্টিয়ার চক দৌলতপুরের মহররমের মেলার। মুসলমানি পরব-উৎসবের মতো বৌদ্ধধর্মের অনুষঙ্গে রচিত মেলার সংখ্যাও সীমিত। এই মেলাগুলোর সবই বৌদ্ধ পূর্ণিমার সঙ্গে যুক্ত। আতোয়ার রহমানের সূত্রে জানা যায়, 'চট্টগ্রামের বিজুড়ি গ্রামে আশ্বিনী পূর্ণিমায় বসে তিন দিনের মেলা, কুমিল্লার বড়ইয়াতে মাঘী পূর্ণিমায় এক দিনের মেলা বসে। সবচেয়ে বেশি সময় বসে মহামুনির মেলা, যার স্থিতিকাল সারা বোশেখ মাস' [*মেলা*, পৃ. ৮১]।

খ্রিষ্টধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত মেলার সংখ্যা আরো নগণ্য। কেবল বড়োদিন উপলক্ষেই দু-এক জায়গায় মেলা বসে। এরমধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন গোপালগঞ্জের মকসুদপুর থানার অন্তর্গত কালীগ্রামের মেলা। মেলাটি প্রায় শতবর্ষের পুরনো। প্রায় ১৪/১৫ বিঘা জমিতে সাত দিন ধরে এই মেলা চলে। মেলাটি এক সময়ে খুবই জমজমাট ছিল। এটিও আর দশটা গ্রামীণ মেলার মতোই। তবে এর ভিন্নতর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কবিগানের আসরে খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও যিশুকীর্তন। মেহেরপুরের বল্লভপুর মিশন এলাকায় একসময়ে জাঁকিয়ে বড়োদিনের মেলা বসত। এখন অবশ্য সে মেলা বিলুপ্ত।

মেলায় এসে পসরা সাজায় কামার-কুমার-ছুতোর-জোলা-কৃষাণ-কাঁসারু-বেদেনি-গালাইকর-হালুইকর। নানা পণ্য সম্ভারের সে এক বিচিত্র সমাবেশ। বিকিকিনির বিশাল হাট। প্রায় একশ বছর আগের এক গ্রামীণ মেলার পণ্য-পসরা আর বিকিকিনির আকর্ষণীয় বিবরণ মেলে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রচনায়। সে মেলা মেহেরপুরের নিকটবর্তী মুরুটিয়ার স্নানযাত্রার মেলা। দেখতে পাই : 'দোকানপশারীও কম আসে নাই, দক্ষিণে কৃষ্ণনগর ও পশ্চিমে বহরমপুর– নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের এই প্রধান নগরদ্বয় হইতেও বিস্তর দোকান আসিয়াছে। দোকানদারেরা সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী চালা তুলিয়া তাহার মধ্যে দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। দু'দিকে দোকান, মধ্যে সংকীর্ণ পথ। এক এক রকম জিনিসের দোকান এক এক দিকে। কোথাও কাপড়ের দোকান, কোথাও বাসনের, কোথাও নানাবিধ মনোহারী দ্রব্যের দোকান।

এতরকম সুন্দর পিতল-কাঁসার বাসন আমদানি হইয়াছে যে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়...। কৃষ্ণনগর হইতে মাটির পুতুলের দোকান আসিয়াছে; নানারকম সুন্দর সুন্দর পুতুল...। জুতার দোকানে চাষীর ভয়ঙ্কর ভিড়; পেটে ভাত না থাক, পায়ে জুতা চাই...। ... কাপড়ের দোকান অনেক দেখিলাম। চাষারা সেখানে বোম্বাই কাপড় চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদারেরা বোম্বাই বলিয়া অসঙ্কোচে বিলাতি চালাইতেছে...!

লোহা-লক্কড় হইতে 'ক্যাঁচকেচের পাটী' পর্যন্ত কত জিনিসের দোকান দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই! মিষ্টান্নের দোকানও শতাধিক।... কুমারের দোকানে মাটির হাঁড়ি-কলসি পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। কাঁঠাল বিক্রেতাগণ ছোটোবড়ো হাজার হাজার কাঁঠাল গরুর গাড়ীতে পুরিয়া বিক্রয় করিতে আনিয়াছে...' [*পল্লীচিত্র*, পৃ. ৫২-৫৪]।

উপলক্ষ যাই থাকুক না কেন, মেলার একটা সার্বজনীন রূপ আছে। মেলায় অংশগ্রহণে সম্প্রদায় বা ধর্মের ভিন্নতা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা মেলার আর্থ-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সবকিছু ছাপিয়ে প্রকাশিত। তাই মেলায় সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের আনাগোনা। মৈত্রী-সম্প্রীতির এক উদার মিলনক্ষেত্র মেলা। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাই আসে মেলায়। তাদের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা একটিই তা হলো– মেলা বা আড়ং দেখা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিকিকিনির আশা আর বিনোদনের টান। গাঁয়ের বধূর ঝোঁক আলতা-সিঁদুর-স্নো-পাউডার-জলে ভাসা সাবান, ঘর-গেরস্থালির টুকিটাকি জিনিসের প্রতি। আকর্ষণ তার যাত্রা বা সার্কাসের প্রতিও। আর শিশু-কিশোরের টান মূলত খেলনার দিকেই। মাটির পুতুল, কাঠের ঘোড়া, টিনের জাহাজ। মুড়ি-মুড়কি, খই-বাতাসা, কদমা-খাগড়াই, জিলিপি-রসগোল্লা– এসব খাবারেও তার তো অরুচি থাকার কথা নয়! সবই তার চাই। সবার ওপরে তালপাতার এক বাঁশি।

এরপর আসে মেলার বিনোদনের দিক। মেলায় আগত দর্শকদের মনোরঞ্জনের নানা ব্যবস্থা থাকে। নাগরদোলা, ম্যাজিক, লাঠিখেলা, কুস্তি, পুতুলনাচ, যাত্রা, কবিগান, বাউল-ফকিরি গান, জারি গান, বায়োস্কোপ তো থাকেই, কখনো কখনো সার্কাসের তাবুও পড়ে। সঙের কৌতুক-মশকরা সারা মেলাকে মাতিয়ে রাখে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেলার চিত্র-চরিত্রেও পরিবর্তন এসেছে। গ্রামীণ মেলা রূপে ও মেজাজে অনেকখানিই বদলেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের পালা-পার্বণ উপলক্ষে যেসব মেলা বসত তার মধ্যে অনেকগুলোই আজ বিলুপ্ত। কোনো কোনো মেলা রূপান্তরিত হয়ে বেঁচে আছে। যেমন– সাতক্ষীরার পাঁচপোতা-রত্নেশ্বরপুর গ্রামে ইংরেজ আমল থেকেই চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কমেলা হতো। শেষ পর্যন্ত এটি বৈশাখি মেলায় রূপান্তরিত হয়।

অন্যদিকে অনেক গ্রামীণ মেলায় আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। বিজলিবাতি পৌঁছেছে গ্রামের মেলায়। নতুন বিন্যাসের ছাপ আজ স্পষ্ট এসব মেলায়। দেশি-বিদেশি চোখ ধাঁধানো বাহারি পণ্যের জৌলুসে দর কমেছে কুটির শিল্পজাত গ্রামীণ পণ্যের। এই রুচির পালাবদল অবশ্য বেশ আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। স্বদেশি যুগেও গ্রামীণ মেলায় দেশি শিল্পের চেয়ে জার্মানির চিনামাটির তৈজসপত্র, বিলাতি কাচ ও এনামেলের বাসন, বিলাতি ছাতার সমাদর ছিল বেশি। বিলাতি সিগারেট ও দিয়াশলাই স্থান দখল করেছিল দেশি তামাক ও চকমরি। এই পর্যবেক্ষণ দীনেন্দ্রকুমার রায়ের।

গ্রামীণ মেলার উজ্জীবনে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা এবং লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মেলার লৌকিক ধারা এসে মিশেছে নাগরিক প্রয়াসের সঙ্গে। বৈশাখি মেলা, ঈদ মেলা, বই মেলা– মেলার লোকধারার প্রেরণা নিয়ে নতুন আঙ্গিক ও মাত্রায় আজ নগরজীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহ্যে পরিণত। এ ধারায় সর্বশেষ সংযোজন বিজয়মেলা, যথার্থই যা ঐতিহ্য ও আধুনিক চেতনার অপূর্ব সমন্বয়। সচেতন মধ্যশ্রেণি তাদের অস্তিত্বের শিকড় যে লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনধারার গভীরে গ্রোথিত এই সত্যটি ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারছে।

লেখক: গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আসুন আমরাও বদলাই

মোনায়েম সরকার

পৃথিবী প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষ তার একমাত্র বাসস্থল পৃথিবীকে নিজের প্রয়োজনেই বদলাতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা যদি লক্ষ করি তাহলে দেখব বিশ শতক উনিশ শতকের রেপ্লিকা নয়, তদ্রূপ একবিংশ শতাব্দীকেও আমরা বিশ শতকের রেপ্লিকা বলতে পারি না। একবিংশ শতকের বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি পূর্বের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে। আগামীতে আরো কত পরিবর্তন দেখতে হবে এই মুহূর্তে তা অনুমান করা কঠিন।

বিশ্বজুড়ে ধনসাম্যের পরিবর্তে এখন ধনবৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে। একদিন আমরা হাত উঁচিয়ে স্লোগান দিতাম 'কেউ খাবে তো কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না।' যারা ভাবেন এই স্লোগানের দিন শেষ হয়ে গেছে আজ তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই স্লোগানের দিন শেষ হয়ে যায়নি। আজ পৃথিবীর এক শতাংশ লোকের হাতে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত আছে, বাকি নিরানব্বই শতাংশ মানুষের হাতেও সেই পরিমাণ সম্পদ নেই। তাহলে অঙ্কটা দাঁড়াচ্ছে এক শতাংশ সমান নিরানব্বই শতাংশ। এক শতাংশ মানুষের হাতে পৃথিবীর সব সম্পদ, সব সুখ বন্ধক রেখে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ কি সুখে থাকতে পারে নাকি সুখে থাকা সম্ভব?

মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস বলে, আমরা বার বার মানুষ হতে চেয়েছি কিন্তু আমরা আসলেই কি মানুষ হতে পারছি? আমরা সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে নিজেদের পরিচয় দিই কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হওয়ার জন্য নয়, প্রতিযোগিতায় নেমেছে সর্বনিকৃষ্ট জীব হওয়ার জন্য। আজ পৃথিবীর দিকে তাকালে ব্যথায় বুক কুঁকড়ে ওঠে, দেশে দেশে বেড়ে যাচ্ছে ছিন্নমূল, দেশহারা মানুষের সংখ্যা। নির্বিচারে তথাকথিত ধনী রাষ্ট্রেরা অত্যাচার চালাচ্ছে গরিব রাষ্ট্রগুলোর ওপর। অস্ত্র বিক্রির জন্য আজ প্রত্যেকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রই চাপ প্রয়োগ করে গরিব রাষ্ট্রগুলোকে অস্ত্র কিনতে বাধ্য করছে। যে সময় অস্ত্র পরিহার করে শান্তির পথে, সাম্যের পথে আমাদের যাত্রা করার কথা ছিল সেই সময় আমরা

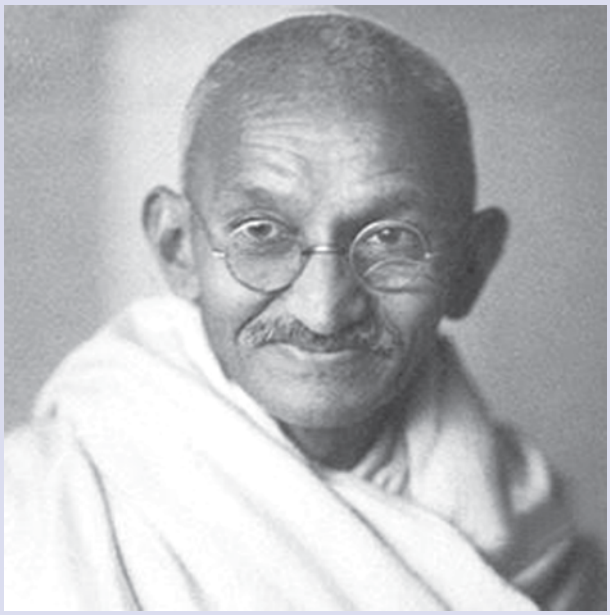

মহাত্মা গান্ধী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যুদ্ধের দিকে, রক্তপাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি– এটা কি আদৌ আমাদের স্বপ্ন ছিল? আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি– সব মানুষকেই আজ এই বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার। উদ্দেশ্যহীনভাবে পাগলের মতো ছুটে চললে আমরা শুধু ক্লান্ত হব, কখনো শান্তি পাব না। আমাদের উচিত পৃথিবীতে আজ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একযোগে কাজ করা।

একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা যেমন করেছে– তেমনি অসুবিধা সৃষ্টির জন্যও কোনো কিছু বাকি রাখেনি। বিজ্ঞান মানুষকে সীমাহীন ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। আজ উত্তর কোরিয়াকে শায়েস্তা করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সামনে থাকা টেবিলের বোতামের ভয় দেখাচ্ছেন অর্থাৎ ট্রাম্পের টেবিলে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন যে বোতাম আছে সেটিতে চাপ দিলেই উত্তর কোরিয়া ধ্বংস হতে বাধ্য। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বিজ্ঞান মানুষকে যেমন অপরিসীম সৃষ্টিক্ষমতা দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাও। আমরা ধ্বংস চাই না, সৃষ্টি চাই। সৃষ্টির পথে থেকেই আমরা রচনা করতে চাই সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। সাম্যের পক্ষে, মুক্তির লক্ষ্যে আজ আমাদের এগুতেই হবে। পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কিছুতেই বিবেকবান মানুষ সমর্থন করতে পারেন না।

পৃথিবীর চারদিকে আজ দেখছি মানবসৃষ্ট পাপ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। দেশে দেশে যুদ্ধ-গৃহযুদ্ধ নিরপরাধ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো পুঁজির লোভে উন্মাদ হয়ে গেছে, মানুষকে যে কাজে মানায় না, যে কাজ করলে মানবতার চরম অমর্যাদা হয়, আজ তারা পৃথিবীব্যাপী সেই কাজগুলোই করে যাচ্ছে। তাদের রাশ টেনে ধরতে না পারলে এই পৃথিবী আর বাসযোগ্য থাকবে না, শ্মশানে পরিণত হবে। আমরা যারা শান্তির স্বপক্ষে দণ্ডায়মান তাদের উচিত সংঘাতের পথ, ধ্বংসের পথ পরিহার করে কল্যাণের দিকে যাত্রা করা। এই যাত্রা যত দ্রুত শুরু হবে ততই মানুষের জন্য মঙ্গল বার্তা বয়ে নিয়ে আসবে।

পত্রপত্রিকার পাতা খুললেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় দৃষ্টি দিলেই চারপাশের নৃশংস ঘটনা দেখতে পাই। আদিম যুগেও মানুষ যা করতে

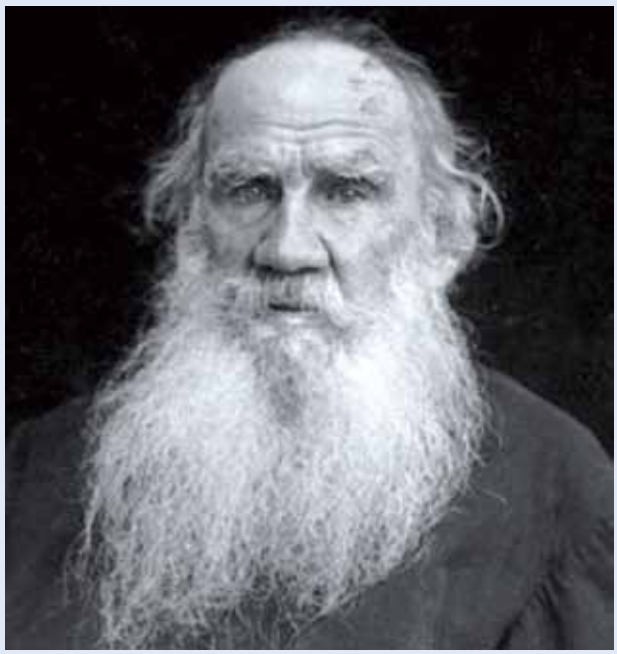

লিও টলস্টয়

দ্বিধা করত, আধুনিকতার প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও সেই বর্বর কাজগুলো করেই মানুষ এখন এক ধরনের বিকৃত সুখ অনুভব করার চেষ্টা করছে। মানুষ এত বিকৃত হচ্ছে কেন? কী কারণে উলটো দিকে চলতে শুরু করেছে লোভে অন্ধ ক্ষণজীবী মানবসন্তান?

আজ ইউরোপজুড়ে অশান্তি। মধ্যপ্রাচ্য দাউদাউ করে জ্বলছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিধন ও নির্যাতন বিশ্ববাসীর আবেগকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে কোনো রকমে রক্ষা পেলেও বাংলাদেশ পড়েছে তীব্র সংকটে। সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে মিয়ানমার বাংলাদেশ ও পৃথিবীকে যে বার্তা দিতে চায় সেটা যে শুভ বার্তা নয় এটা মোটামুটি নিশ্চিত। শুধু মিয়ানমার নয় সিরিয়ায় সাম্প্রতিককালে যে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী তার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। ইয়েমেন-প্যালেস্টাইনে প্রতিদিন যে রক্ত ঝরছে সেই হিসাব আর কত কষতে হবে আমাদের? এর কি কোনোই সমাধান নেই? এই সংঘাতের বৃত্ত থেকে কি কখনোই মুক্তি সম্ভব নয়?

সমগ্র পৃথিবী এর আগে দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে। দেখেছে আরো অসংখ্য ছোটো-বড়ো গৃহযুদ্ধ। ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পড়েও অসংখ্য দেশ সর্বস্বান্ত হয়েছে। এত যুদ্ধ-বিগ্রহ, শোষণের অভিজ্ঞতা থাকতেও মানুষ কেন আজ আবার যুদ্ধের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে– সেটাই সবচেয়ে বেদনাদায়ক। একবিংশ শতাব্দীর এই উৎকর্ষের যুগে এসেও কেন আমরা দিন দিন অমানবিক হয়ে উঠছি, হিংস্র থেকে হিংস্রতর হচ্ছি– আমাদের আজ এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া দরকার।

বর্তমান পৃথিবী এখন একটি মানবিক সমাজব্যবস্থা প্রত্যাশা করছে। এই মানবিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের সবাইকে আজ লোভ পরিহার করতে হবে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে ওঠে অসাম্প্রদায়িক আচরণ করতে হবে। গণতন্ত্রের চর্চা দেশে দেশে আরো ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মারণাস্ত্র উৎপাদন সর্বাংশে পরিহার করতে হবে। যে নিরন্ন মানুষের মুখে আমরা একমুঠো অন্ন তুলে দিতে পারি না, সেই অনাহারী মানুষকে হত্যা করার অধিকার কি আমাদের আছে? নাকি সেই অধিকার থাকতে পারে? আমরা যদি কারো মঙ্গল করতে না পারি, তাহলে তার অমঙ্গল কামনা করি কেন?

আমরা এখন এমন এক সময়ে বসবাস করছি যে সময় সত্যিকার অর্থেই চরম অস্থির। অস্থির সময়ের সন্তান হিসেবে আমরাও গা ভাসিয়ে দিচ্ছি ব্যক্তিগত ভোগবিলাস আর স্বার্থপরতায়। কিন্তু আমরা যদি দাসপ্রথাবিরোধী নেতা আব্রাহাম লিংকনের দিকে তাকাই, তাহলে মানবতাবাদী শিক্ষা নিতে পারি। আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন একটি অসচ্ছল পরিবার থেকে নিজের শ্রম ও প্রজ্ঞা দিয়ে বরেণ্য হয়েছিলেন, হৃদয় জয় করেছিলেন কোটি কোটি মানুষের। ভারতবর্ষের মহাত্মা গান্ধীও আদর্শ ও প্রেরণার বাতিঘর হয়ে আছেন বিশ্ববাসীর কাছে। বাঙালিশ্রেষ্ঠ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করে, নির্লোভ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শুধু বাঙালির সামনেই নয়, বিশ্ববাসীর সামনে সততার ও মহানুভবতার যে কীর্তি সৃষ্টি করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কথাও আমরা ভুলে যাই কেন? দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের যে উদাহরণ বঙ্গের এই নির্ভীক সন্তান সৃষ্টি করেছেন তা এক বিরল ইতিহাস। আমরা নৃশংস রাষ্ট্রনায়ক হিটলারকে দেখেছি, দেখেছি হিটলারের দোসর ইটালির মুসোলিনি ও জাপানের তোজোকে। কুখ্যাত একনায়কেরা যুগে যুগে পৃথিবীব্যাপী যে তাণ্ডব চালিয়েছে, নির্বিচারে যে পরিমাণ মানুষ হত্যা করেছে তার পরিসংখ্যান ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে।

আমরা একটি গল্প জানি, যে গল্পটি একজন ভূমিলোভী মানুষের। তাকে বলা হয়েছিল– তুমি দৌড়াও। তুমি যতদূর দৌড়াতে পারবে, ততদূর পর্যন্ত জমিই তোমাকে দেওয়া হবে। জমির লোভে দৌড়াতে দৌড়াতে লোকটি এক সময় মারা গেলেন, সেই সঙ্গে মারা গেল তার সম্পদ-আকাঙ্ক্ষাও।

বিশ্ববিখ্যাত লেখক টলস্টয় জমিদার ছিলেন। লেখালেখি করেও তিনি প্রভূত সম্পদ অর্জন করেছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে ঘর থেকে শূন্য হাতে বের হয়ে যান। মৃত্যুবরণ করেন নিঃসঙ্গ-সামান্য মানুষের মতো। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সাড়ে তিন হাত ভূমিই মানুষের শেষ সম্বল। তাই যদি হয়, তাহলে পৃথিবীতে আমরা এত সম্পদের পাহাড় কার জন্য, কিসের জন্য রেখে যাচ্ছি?

আমাদের যৌবনে একটা গান শুনেছিলাম– 'পৃথিবী বদলে গেছে– যা দেখি নতুন লাগে', আসলেই তাই। পৃথিবী প্রতিদিন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। এই বদলানোতে আমরা আশাবাদী হতে পারতাম যদি বদলানো শুভ হতো, কিন্তু আমাদের এই মুহূর্তে আশাহত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। পৃথিবী বদলাচ্ছে বটে, তবে এই বদলকে অবশ্যই কল্যাণমুখী করতে হবে, মানবিক করতে হবে। অন্যকে কষ্ট দিয়ে, মৃত্যু যন্ত্রণার ভেতর ঠেলে দিয়ে পৃথিবীকে যারা বদলাতে চায় সেই বদলানোকে আমাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

মানুষই মানুষের ভরসার জায়গা। মানুষই মানুষের সুখ-দুঃখের একমাত্র আশ্রয়স্থল। মানুষকে অকারণে কিংবা অর্থের লোভে হত্যা করে যারা আনন্দ পায়, ধনসম্পদের পাহাড় গড়তে চায়– আমাদের সবার উচিত হবে তাদের ঘৃণা করতে শেখা। পৃথিবীর সবকিছুই সুন্দর, মূল্যবান, সম্মানীয় এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে চাই– 'যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়, সকলই দুর্লভ বলে আজি মনে হয়। দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান, দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।' পৃথিবীতে সকলেই সুখে থাকুক। নির্বিঘ্ন হোক আমাদের সবার জীবন। জয় হোক মানবতার, জয় হোক ভ্রাতৃত্ববোধের।

লেখক: বঙ্গবন্ধু গবেষক ও প্রাবন্ধিক

নবরূপে বৈশাখ নবশক্তির বিকাশ

মফিদুল হক

বৈশাখের আছে বাইরের এক সাজ, সেই সঙ্গে আছে অন্তর্জগৎ। বাইরের সাজ আমাদের নজরকাড়ে প্রবলভাবে, সেটা নিয়ে বাদ-বিসম্বাদও কম নেই। কিন্তু ভেতরের তাৎপর্য থাকে অনেকটা আড়ালে। পাকিস্তান আমলে বৈশাখ ছিল অস্বীকৃত ও বিস্মৃত। নাগরিক জীবনে বৈশাখ পালনকে শাসকগোষ্ঠী সুনজরে দেখেনি। গ্রামীণ বৈশাখি উৎসব তথা মেলা ক্রমেই হয়ে পড়ছিল ক্ষীয়মাণ। এমনি পরিস্থিতিতে বৈশাখের নব-উদ্ভাসন ঘটালো ছায়ানট। সে সময় বৈশাখের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের মধ্যে মিল খুঁজে পেতে মানুষের খুব বেগ পেতে হয়নি। বোধ করি পাকিস্তানিরাই সেটা সহজ করে দিয়েছিল, বৈশাখের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে।

ষাটের দশকে বাঙালির প্রতিরোধ চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করে সাংস্কৃতিকভাবে এবং ভাষা-সংস্কৃতি ঘিরে বাঙালিত্বের প্রকাশ দেশবাসীকে আপন সত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে থাকে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি মতাদর্শ এবং সম্প্রীতির বাঙালি চেতনা মুখোমুখি অবস্থান নেয়। তখন চলছে আইয়ুবের সামরিক শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপ। সব রকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ কারাগার। সে সময় ১৯৬১ সালে শাসকগোষ্ঠী বাঙালির অনন্য প্রতিভার স্মরণে বিশেষ আনন্দোৎসবকে 'হিন্দু' চেতনা প্রসারের ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিল। এর বিপরীতে নানা আয়োজনে পালিত হয়েছিল কবির জন্মশতবার্ষিকী। তবে এর ছিল এক ধরনের সীমাবদ্ধতা। মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নগরবাসী ছিল এর রূপকার ও ভোক্তা। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এ উৎসবের বাণী তেমন জোরদারভাবে পৌঁছতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে সার্বজনীনতার উপাদান এতে ছিল; কিন্তু সার্বজনীন হয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন ছিল আরো অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ।

বৈশাখি উৎসব তথা বাঙালির বর্ষবরণ হয়ে উঠল তেমনি এক পদক্ষেপ। পহেলা বৈশাখ প্রভাতে রমনার পাকুড় ছায়াতলে রবীন্দ্রনাথ-নজরুলসহ বাঙালির চিরায়ত গান, কবিতায় বর্ষবরণ ছিল অভিনব আয়োজন, যা আলোড়িত করে জাতির চিত্ত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সামাজিক বিবিধ উদ্যোগ, বাঙালির আত্মআবিষ্কার ও আত্মোপলব্ধির নবযাত্রা সূচিত হয় সাংস্কৃতিক এসব পদক্ষেপকে ঘিরে। বাঙালির বর্ষবরণ নিছক আনুষ্ঠানিকতা থাকে না। অনুষ্ঠান অর্জন করে বৃহত্তর তাৎপর্য। বাইরের সাজ ও ভেতরের শাঁস দুইয়ে মিলে আমরা পাই ভিন্নতর জাগরণী শক্তি, যা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে পৌঁছে দিয়েছিল একাত্তরের মহান সংগ্রামের দুয়ারে।

আজ যখন আমরা ফিরে তাকাই বৈশাখের দিকে, তখন এর পরিবর্তনময়তা আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। স্বাধীন বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল সংগতভাবেই। সেই সঙ্গে বৈশাখ উদ্‌যাপনের মধ্যে প্রসারতা ঘটে চলে নানাভাবে। প্রভাতি সংগীতানুষ্ঠান হয়ে উঠেছে দেশব্যাপী প্রসারিত এক রীতি। গ্রামীণ মেলা উপচে এসেছে শহরে। লোকশিল্প সেখানে যেমন জায়গা পাচ্ছে, লোকক্রীড়াও কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বাঙালির বসন ও রসনা বৈশাখি হয়ে ওঠার জন্য এখন এক প্রতিযোগিতাতেই বুঝি মেতেছে। তার ফলে বৈশাখের রং পোশাকি রূপ নিয়ে পথে পথে ছড়িয়ে পড়ছে জনরুচির বাহন হয়ে। বৈশাখি আহারপাত পাতছে অনেক সংসারে। মুদ্রিত মাধ্যম এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যম বর্ষবরণের নানা উপদেশ ও উপচারে ভরপুর হয়ে উঠছে। কিন্তু বাইরের সাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গের যে সম্পদ সেটা সমতালে ছন্দ মিলিয়ে চলছে কি-না তা দেখার গুরুত্ব রয়েছে। বৈশাখের সঙ্গে জাতি-চেতনা ও জাতির মুক্তিস্পৃহার যে সম্পর্ক পাকিস্তান আমলের বিরুদ্ধ পরিবেশে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আজকের দিনে তার রূপ ও অবলম্বন কী হবে সেটা কতটা আমরা বুঝে নিতে পারছি তা এক প্রশ্ন বটে। বৈশাখ আজ যে সার্বজনীনতা অর্জন করছে সেটা ইতিবাচক ও বিশাল পরিবর্তন বটে, তবে পরিবর্তনের স্রোতে বেনোজলের প্রবেশের চেষ্টাও যে থাকে না, তা নয়। এক সময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় রজনীর মধ্যযামে হ্যাপি নিউ ইয়ারের আদলে বর্ষবরণ রীতি দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছিল সরকারিভাবে। সেই প্রয়াস অবশ্য বিশেষ অভিঘাত তৈরি করতে পারেনি। জীবনস্রোতের টানে আপনিই গিয়েছিল ভেসে। কয়েক দশক আগে বৈশাখি উৎসবে সানকিতে পান্তাভাত খাওয়ার বাণিজ্যিক আয়োজন রমরমা হয়ে উঠেছিল। তবে এ আদিখ্যেতা সমাজ কর্তৃক তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। যদিও এমন অন্তঃসারশূন্য বহিরঙ্গ একেবারে বিলুপ্ত হয়নি; তবে পূর্বের অবস্থান যে বিলীয়মান হয়েছে, সেটা স্বস্তিবহ। হাল জমানায় তেমনি এক উন্মাদনা সঞ্চার করা হয়েছে বৈশাখের আহারে ভাজা ইলিশ যুক্ত করে। চিত্তহীন বিত্তশক্তি যে-কোনো হুজুগ তৈরি করতে পারে তার উদাহরণ এই নব পরিবর্তন, পকেট স্ফীত হওয়ার পাশাপাশি জিহ্বাও যে প্রসারিত হচ্ছে বাঙালির, তার প্রকৃতি-সংহারক বর্বর উদাহরণ আমরা অনেক পাই। নদী গ্রাস ও বনভূমি কিংবা পাহাড় উজাড় করা এসবের করুণ দৃষ্টান্ত। তবে সেসব গ্রাস করছে বিশেষ এক গোষ্ঠী, গোটা সমাজের সম্পৃক্ততা সেখানে কম। কিন্তু অসময়ে ইলিশের দিকে যে থাবা বাড়িয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত, সেটা পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় অবিশ্বাস্য পর্যায়ে, জন্ম দিচ্ছে বিশাল বাজারি বাণিজ্য, যার সুফল পাচ্ছে না জাল-ফেলা জেলেরা। কুফল হিসেবে নিমিষে উবে যাচ্ছে কয়েক হাজার টন খুদে ইলিশ, যাদের বিকাশ সম্ভাবনা কিংবা প্রজনন চক্র বিনষ্ট হয়ে উজাড় হচ্ছে জাতির মৎস্য সম্পদ।

বৈশাখের সঙ্গে অর্থনীতির যোগ তো সব সময়ে ছিল নিবিড়, বিশেষভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার প্রকাশ দেখি মেলায় এবং শহুরে অর্থনীতিতে হালখাতায়। বৈশাখের এই অর্থনীতির বিকাশ ঘটছে জাতীয় আর্থিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে মিল রেখে। বৈশাখি সজ্জা এক্ষেত্রে এক ইতিবাচক পরিবর্তন, যেখানে তরুণরাই এর রূপকার। বৈশাখের সাজ ও রঙের মধ্য দিয়ে তারা বাঙালিয়ানার রূপ খুঁজে ফিরছেন এবং তার নবউদ্ভাসন ঘটাচ্ছেন। মঙ্গল শোভাযাত্রাও একেবারে হালের বিষয়, যা ক্রমেই সার্বজনীন আনন্দ-উৎসবে রূপ নিচ্ছে দেশব্যাপী বিস্তার ঘটিয়ে। সরকার বৈশাখি উৎসব-ভাতা প্রবর্তন করে এর অর্থনীতি আরো সচল করতে ভূমিকা পালন করছে, সেটাও সুলক্ষণ।

বৈশাখি উৎসব বাঙালি জাতিকে যে গৌরবের প্রান্তরে দাঁড় করায় তা সার্থক করে তুলতে হলে এর অন্তরের দিকে আমাদের আরো গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। অন্তর্গতভাবে বৈশাখ হচ্ছে সার্বজনীন, সব ধর্ম ও মতের বাঙালির এক হওয়ার পণ ও পন্থা– যে বাঙালি স্বভাবগতভাবে মিলনে-মিশ্রণে গড়ে ওঠা অসাম্প্রদায়িক মানবসত্তা তথা জাতিসত্তা। এই সম্প্রীতি চেতনা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ী ধারা বৈশাখের মর্মবাণী, আজকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে যা হয়ে উঠেছে আরো গুরুত্ববহ। বৈশাখি উৎসবের শক্তিময়তা এখানেই নিহিত। এর বাস্তবায়নে বৈশাখ কতভাবে কতরূপে ভূমিকা পালন করতে পারে সেটাই বড়ো বিবেচ্য। আর সেজন্য প্রয়োজন বৈশাখি উৎসবের প্রতি আরো নিবিষ্ট মনোযোগ ও গভীর বিবেচনা প্রদান।

লেখক: প্রকাশক ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি

মিশে যাবে আগ্নেয় অঙ্গার

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

গ্রীষ্মের রোদ্দুরে ক্রমে নেচে ওঠে অশান্ত সমীর
অনন্ত দহনে তপ্তপ্রাণ আজ অধীর-অস্থির।
পৃথিবীর রুদ্ররূপ ক্রমাগত ডাকে ঘূর্ণিবায়ু
মৃত্যুর পঞ্জিকা হাতে জীর্ণ পাতা গোনে তার আয়ু।

মাঠের প্রান্তরে উদাসী বাতাস, বন-বনান্তরে
পাখির তৃষ্ণায় কষ্টে কেঁদে ওঠে মাটির অন্তর।
এমন দহন দিনে রিক্ত-সিক্ত বিষাদের সুরে
রুদ্রতা খেলেছে খেলা ধূধূ দৃষ্টি ছুঁয়ে থাকা দূরে।

অসীম আকাশে কালো মেঘবতী নীলাম্বরী ছায়া
সাম্য-সুখে করে উজ্জীবিত প্রীতি, ভালোবাসা, মায়া।
সজীবতা খুঁজে পাবে মানুষের সাজানো সংসার
পথের ধুলায় মিশে যাবে যত আগ্নেয় অঙ্গার।

প্রেমময় স্পর্শে হবে স্নিগ্ধতার স্বপ্ন ভারানত
পৃথিবীর প্রান্তে রবে না বৈরিতা রোদে দগ্ধক্ষত।
শুভ নববর্ষ হবে প্রশান্তির একান্ত স্বজন
বটের ছায়ায় শুটকি-পান্তায় বৈশাখি ভোজন।

ঢাকা আমার ঢাকা

শাফিকুর রাহী

কত না দিন রাত্রি আমি এই শহরে একা,
রাত্রি জেগে দুঃখ ভোলার গান-কবিতা লেখা।
ধুলোবালির এই শহরে পুষ্পে ঘেরা মাটি,
ফুটপাতে ও শ্বেতপাথরের ঢাকনা ঢাকাঢাকি।
মোগল-ঈশাখাঁও বুঝি ঢাকার প্রেমে পড়ে
শান-শওকত সদাগরির রঙ্গ-রসে লড়ে।

এ ঢাকারই মোগলটুলি ধুপখোলারই মাঠে
নাগরদোলায় বাতাস নাচে পহেলা বৈশাখে।
সময়েরই বিবর্তনে সবকিছু যে বদলায়,
কাবাডি আর ডাংগুলিও হারিয়ে গেল হায়!
ঢাকার ঐতিহাসিক ভূগোল নদ-নদীতে ঘেরা
গঙ্গা-তুরাগ-শীতলক্ষ্যায়-ধলেশ্বরীর ফেরা।

নদীর জলেই ঢাকাবাসীর হতো নাওয়া-খাওয়া
টাকা হলে বাঘের চোখও যেত ঢাকায় পাওয়া!
এ ঢাকাকে ভালোবেসে মজনু হলাম আমি
লাইলি লাইলি তপস্যাতে দিনরাত্রি ঘামি!
দুর্ভাগার নসিবে বুঝি নেই কোনো ফুলপরি;
অধরা রূপসীর খোঁজে জীবনযুদ্ধে লড়ি!

ঢাকা আমার ঢাকারে তোর প্রেমের জাদুকলায়
বন্দি আমি ফাঁইসা গেলাম কালিন্দীর স্রোতধারায়–
তোমার রূপের সপ্তকলায় মাতাল আত্মভোলা
সুবর্ণ জয়ন্তী কাটে হয়ে যে প্রাণখোলা।
ঢাকা আমার বাংলাদেশের রাজধানীও বটে
মায়ার কাজল চোখে মাখা চিত্র আঁকা পটে।

কোটি লোকের কান্না-হাসি মায়াবী ললাটে
সুখ-স্বপ্ন নৃত্য করে উদাস মনোমাঠে।
এক সময় যে এই শহরে প্রেমেরই সাতকাহন
কত রঙিন স্বপ্নেঘেরা ঘোড়ার গাড়ি বাহন
গাঁ-গেরামের কত মানুষ জীবিকার সন্ধানে
ঢাকার কোলে গড়ল বসত সুখ-আনন্দ বানে।

বৈশাখ

সালমা নাসরীন

বৈশাখ এলে ছোটো-বড়ো সকলে
আনন্দে ভাসায় ভেলা
বৈশাখ এলে হালখাতা খোলে
চারদিকে নিমন্ত্রণ মেলা।

বৈশাখে ফোটে গাঁদা ফুল
গন্ধে ভরে আম-মুকুল
আসে নববর্ষ বরণের ধুম।
চারদিকে এত সুর সুবাতাস সুমধুর
কারো চোখে নেই কোনো ঘুম।

বৈশাখি ঝড়ো হাওয়া, সুখের পরে সুখ চাওয়া
অবারিত আনন্দের সহস্রধারা,
আলো-আঁধারির অপূর্ব খেলায়
বাহারি রঙের অজস্র মেলায়
নববর্ষের ডাকে তাই প্রকৃতি দেয় সাড়া।

হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে যেন ঝরো না
সকালের আনন্দটুকু মাটি করো না
ধরণীর বুক ভরা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
যার কেউ নেই তার হাত ধরো না
নিপীড়িতের ক্রন্দন মুছে দাও না
ছড়াও মনে তার অপার বিশ্বাস।

বর্ষবরণের মাহেন্দ্রক্ষণে
হাসি ফোটানোর শপথ নিয়ে মনে
দূর কর রিক্তের হাহাকার।
নববর্ষের এ বিপুল আয়োজনে
আর্ত-মানবতার ইমন কল্যাণে
ব্যয় কর কিছু অংশ জীবিকার।

মনে রেখ, সহায়তা বিন্দু বিন্দু
গড়ে তুলবে বিশাল সম্ভাবনার সিন্ধু
নিঃস্ব ও দুঃস্থ মানুষের জন্য।
দিন চলে যাবে রাত ফিরে আসবে
রাতের আকাশ তারায় ভাসবে
মানুষের তরে মানুষ হবে বরেণ্য।

সব বাড়ি ভুলে ছিল

সোহরাব পাশা

তখন মৃত্যুর কোনো দীর্ঘ গল্প খোঁজেনি জীবন,
জংধরা কুটিল সময় পাখিদের তবু ছিল
ফেরার গন্তব্য পত্রপল্লবের তাবু,
মানুষের আকাশ ছিল না। পাথর নৈঃশব্দ্য চোখে
ওড়াউড়ির উজ্জ্বল উচ্ছ্বাস ছিল না।

একদিন পাতার আগুনে বৃক্ষছায়াও পুড়ে গেল
মেঘে ছিল না বৃষ্টির ভাঁজ, আগুনে ভেজার শব্দ
অবাধ সাঁতার ভুলে ছিল সব নদী;
সব বাড়ি ভুলে ছিল মানুষের ছায়া
ছায়ার নিবিড় দ্যুতি আর
চুম্বনের কোলাহল;
তবু কারো সোনার আঙুলে রাত্রির গোপনে ছিল
গোলাপ ফোটানো ভোর, শাণিত রোদ্দুর এই তীব্র
অসামান্য সবুজ সুন্দর।

১৭ই এপ্রিল: ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়

বাহালুল মজনুন

পঁচিশে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদাররা শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে রক্তের সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে যে ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর গণহত্যা শুরু করেছিল, মৃত্যু-ধ্বংস-আগুন-আর্তনাদের বীভৎস খেলায় মত্ত হয়ে যে বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে কেবল পরিত্রাণই নয়, স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। এই সরকার যে দিনটিতে শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছিল, সেই দিনটিতেই আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য আনুষ্ঠানিকভাবে উদিত হয়েছিল। এজন্য এই দিবসের মাহাত্ম্য বাঙালি জাতির জীবনে অনির্বাণ শিখার মতো সর্বদা বহমান থাকবে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঁচিশে মার্চে গ্রেফতারের আগে যেমন ওয়্যারলেসে স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড করে রেখেছিলেন, তেমনি একটি সরকার গঠনের পরিকল্পনাও করেছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ীই পরবর্তীকালে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল, যা মুক্তিযুদ্ধকে সাংগঠনিক কাঠামোতে রূপদানের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পথকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ত্বরান্বিত করেছিল। এই সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ, ইচ্ছা বুকে ধারণই নয়, তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছে। তাঁদের দক্ষ নেতৃত্ব গুণেই মুক্তিযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ থেকে 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু' রণধ্বনি কণ্ঠে তুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন হানাদার বধে আর ছিনিয়ে এনেছেন বিজয়ের সেই লাল-সবুজ পতাকা।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক আম্রকানন

আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা তাজউদ্দীন আহমদ ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে নিয়ে ৩১শে মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়ে বুঝেছিলেন প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকার ব্যতীত আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে দেশের জন্য কেবল সহানুভূতি ও সমবেদনাই তিনি পেতে পারেন। অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করলেন। কিছু বিরোধিতার মুখোমুখি হলেও তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে ১০ই এপ্রিল ঘোষণা করেন অস্থায়ী সরকার। সেই ঘোষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি ও নিজেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। এই সরকারের মূল ভিত্তি ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচন, যেখানে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল এবং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই এই অস্থায়ী সরকার গণতান্ত্রিক রূপ লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির নাৎসি বাহিনী ফ্রান্স দখল করে নিলে জেনারেল দ্য গল লন্ডনে যেভাবে ফ্রান্সের প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন, অনেকটা সেভাবেই বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর আদর্শের উত্তরসূরিরা কলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে স্বাধীন বাংলাদেশের এই অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন। এই সরকারের সঙ্গে কম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুকের গঠিত সরকারের তুলনা করা যায়, যার সদর দপ্তর দীর্ঘকাল চীনের বেইজিংয়ে ছিল; এমনকি কোনো কোনো সময়ে থাইল্যান্ডেও ছিল। অথবা জাপান সাম্রাজ্যের বিপক্ষে গঠিত সাংহাইতে পরিচালিত কোরিয়ার অস্থায়ী সরকার, কিনশাসা থেকে পরিচালিত অ্যাঙ্গোলার রিপাবলিকান সরকার, প্যারিস থেকে পরিচালিত পোল্যান্ডের নির্বাসিত সরকারের সঙ্গেও মুজিবনগর সরকারকে তুলনা করা যায়।

সে যা হোক, সময়ের প্রয়োজনে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে অস্থায়ী সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রথাগতভাবেই শপথ গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়েছিল। এজন্য ১৪ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গাকে রাজধানী করে সেখানে সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সনদ ঘোষণার ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের গোপন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খবরটি যে-কোনোভাবে হোক পৌঁছে গিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদারদের কাছে। তারা ১৩ই এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় বিমান থেকে বৃষ্টির মতো বোমাবর্ষণ করতে থাকে। বাধ্য হয়ে অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায়। এরপর খুবই সতর্কতার সঙ্গে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে সর্বোত্তম নিরাপদ একটি স্থান হিসেবে মেহেরপুরকে শপথ অনুষ্ঠানের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন তাজউদ্দীন আহমদসহ বিশ্বস্ত কয়েকজন। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এতই কঠিন গোপনীয়তা অবলম্বন করেছেন যে, মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেননি যে, কলকাতা থেকে শত শত মাইল দূরে বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসের এক স্বর্ণালি অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে; ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বাংলার যে স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল তার ঠিক ২১৪ বছর পরে মেহেরপুরের অখ্যাত ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার এক আম্রকাননে বাংলার সেই অস্তমিত স্বাধীনতার সূর্য আবারো উদিত হতে যাচ্ছে।

ইন্দিরা গান্ধীর হুকুমে ১৭ই এপ্রিল সকালে দমদম এয়ারপোর্টে গোপনে সজ্জিত হয়েছিল ভারতীয় যুদ্ধবিমান বহর। মেহেরপুর সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থান করছিল ভারতের সামরিকবাহিনী। মেহেরপুর আম্রকাননের দূরদূরান্তে ঘাস-পাতা বিছানো জালের ছাউনিতে ভারতীয় বাহিনীর অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান মেহেরপুরের আকাশ নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছিল। আম্রকাননের চারদিকে রাইফেল হাতে কড়া প্রহরায় ছিল মুক্তিযোদ্ধারা। গুরুত্বপূর্ণ এই শপথ অনুষ্ঠানের আগের রাতের মুষলধারে বৃষ্টি যেন সেই আম্রকুঞ্জে শুভ্র পবিত্র আবহ তৈরি করে ওই দিনটির মাহাত্ম্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। আকাশে মেঘের সঙ্গে আলোর অবিরাম লুকোচুরি খেলা চলছিল। বৈশাখের সোনালি রোদ আর আম্রকুঞ্জের দুরন্ত বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে আগত মানুষজন যেন দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত বিজয় সংগীত শুনতে পাচ্ছিল। কাভার করার জন্য দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে

এসেছিলেন। শত শত কণ্ঠের 'জয় বাংলা', 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'– গগনবিদারী স্লোগানে স্লোগানে আম্রকাননের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়েছিল সেদিন। খোলা আকাশে চৌকি পেতে তৈরি করা হয়েছিল শপথ মঞ্চ। মঞ্চের সামনে বাঁশের মাঝামাঝি বাঁধা কালরাতের বিভীষিকার রক্তে রঞ্জিত, অকুতোভয় বাঙালির শৌর্য থেকে উৎসারিত স্বাধীন বাংলার লাল-সবুজের পতাকা।

বেলা ১১টায় শুরু হয়েছিল শপথ অনুষ্ঠান। মাইকে অনুষ্ঠানের ঘোষণা করছিলেন আবদুল মান্নান। শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' রূপে ঘোষণা করা হলো। সেদিন কোরান তেলাওয়াতের জন্য কোনো ইমাম, মুয়াজ্জিনকে পাওয়া যায়নি। তাই উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা ভিড়ের মধ্য থেকে মেহেরপুর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র বাকের আলীকে তুলে আনল কেরাত পড়তে। তার মিষ্টি কেরাতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল অনুষ্ঠান। অবশ্য এই কেরাত পড়ার জন্য পাকিস্তানি হানাদাররা পরবর্তীকালে তার গায়ে গুড় মাখিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে শরীরে পিঁপড়ের বাসা ঢেলে দিয়েছিল। ৪৬৪ শব্দে রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্রটিই হলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান আইনি দলিল, যা আমাদের সংবিধান এবং সরকার গঠনের মূল ভিত্তি। প্রজাতন্ত্রের সূচনালগ্নে এই ঘোষণাপত্রটি রাজনৈতিক বৈধতার শক্ত ভিত হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যের জন্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা গৌরব বহন করে যাবে। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র উদ্ভাবনের প্রেক্ষাপট, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সীমাহীন নিপীড়ন-নির্যাতন-বঞ্চনা, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির বীরত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে।

ঘোষণাপত্রে গণপ্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার– এই তিনটি বিশেষ শব্দ চয়ন করা হয়, যা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে চর্চিত হয়ে এসেছে কয়েক সহস্র বছর ধরে। ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণের সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ঘোষণাপত্র তথা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ। এখানে সাম্য বলতে সব নাগরিকের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমান অধিকার থাকার কথা বোঝানোর মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের কথাই বলা হয়েছে। মানবিক মর্যাদার উল্লেখের মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকার কথা বলা হয়েছে এবং সামাজিক সুবিচার বলতে সকল প্রকার আর্থসামাজিক শোষণমুক্ত সমাজকে বোঝানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সেই চাওয়াকে গুরুত্ব দিয়ে ঘোষণাপত্রে এই শব্দগুলো যুক্ত করা হয়েছিল, যা বাহাত্তরের সংবিধানে বিশদভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে মাঝখানে দেশ তার অসাম্প্রদায়িক সেই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেললেও বর্তমানে বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই সংবিধানকে সমুন্নত রাখার মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে বাঙালির মাঝে প্রবহমান অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ফিরিয়ে এনেছেন পারঙ্গমতার সঙ্গে।

সে যা হোক, ঘোষণাপত্র পাঠ করার পর মঞ্চে ধীর পায়ে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও কর্নেল ওসমানী। উচ্চারিত হলো পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ এইচ এম কামারুজ্জামান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদকে শপথবাক্য পাঠ করানো হলে মুহুর্মুহু করতালি, স্লোগান আর ফ্ল্যাশলাইটের ঝলসানো আলোই প্রমাণ করে দিচ্ছিল বাঙালির জীবনে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে, যে সূর্যের আলোয় মাখামাখি হয়ে বাঙালি গেয়ে যাবে নবজীবনের গান। এরপর তাঁদেরকে গার্ড অব অনার দেন তৎকালীন মেহেরপুরের এসডিপিও এসপি মাহবুব উদ্দিন বীরবিক্রম। মেজর আবু ওসমান চৌধুরী তার কন্টিনজেন্ট নিয়ে গার্ড অব অনার দেওয়ার কথা থাকলেও দেরি হয়ে যাচ্ছিল বিধায় তৎকালীন এসডিও তৌফিক-ই-এলাহীর পরামর্শে মাহবুব উদ্দিন কয়েকজন পুলিশ সদস্য ও আনসার নিয়ে গার্ড অব অনার দিলেন। জাতীয় সংগীত গাওয়া হলো। মানচিত্র খচিত স্বাধীন দেশের পতাকা উড্ডয়ন করা হলো।

সবার চোখেই খেলা করছিল পরাধীনতার তমসা হরণের বিস্মিত জ্যোতি, যা আম্রকুঞ্জের পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত সোনালি সূর্যের ঋজু রশ্মির সঙ্গে মিশে এক অনবদ্য ঐক্যবদ্ধ শক্তির ইন্দ্রজালের প্রতিচ্ছবি এঁকে দিয়ে জানান দিচ্ছিল বীর বাঙালি পাকিস্তানকে বিদীর্ণ করে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিতে পেরেছে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর সেদিনের ভাষণে দৃপ্ত কণ্ঠে পাকিস্তানি জান্তা ইয়াহিয়াকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি মিলিটারি যারা রক্ত ঝরাচ্ছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমাদের ছেলেরা ধ্বংস করে দেবে। এই যুদ্ধে জয় আমাদের অনিবার্য। আমরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়ন করবই। আজ না জিতি, কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই। পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের সংযোজন হলো তা চিরদিন থাকবে।' তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, 'আমরা যা করছি সবই মুজিবের নির্দেশে। পাকিস্তান কবরস্থ হয়েছে লাখো বাঙালির মৃতদেহের স্তূপে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এ নতুন শিশুরাষ্ট্রকে লালনপালন করছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ আজ এক বাস্তব সত্য।' তাদের সেদিনের ভাষণ বিশ্ববাসীর কাছে সেই বার্তাই বইয়ে দিয়েছিল যে, বাঙালি তাদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে শুধু প্রস্তুতই নয়, দেশমাতৃকার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর।

প্রকৃতপক্ষে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বাঙালিদের আত্ম-বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জুগিয়েছিল। আর মুজিবনগর সরকার হয়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণার উৎস। প্রবাসী, বিপ্লবী, অস্থায়ী কিংবা মুজিবনগর সরকার, যে নামেই ডাকা হোক না কেন, যুদ্ধকালীন সরকার পরিচালনায় দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিল ওই সরকার। মুজিবনগর সরকারের অধীনেই চলেছিল বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত মুজিবনগর সরকার ছিল সম্পূর্ণ বৈধ একটি সরকার, যা না হলে জনগণ যতই প্রশংসা করুক না কেন, আমরা আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা বিদ্রোহী হয়ে পড়তাম। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, স্বাধীনতার স্বপক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা, গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা, শরণার্থী সমস্যার সমাধানের জন্য সেই সময় এই সরকার গঠন ছিল যুগান্তকারী এক সিদ্ধান্ত। সীমিত সামর্থ্য আর বৈরী পরিবেশে তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যে এই সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা, দেশের অভ্যন্তর থেকে লাখ লাখ মুক্তিপাগল ছাত্র-যুবাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলাবাহিনী গঠন করে পাকিস্তানিদের মাঝে ত্রাসের সৃষ্টি, স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ রাখা এবং বিশ্বজনমত গঠনসহ বিভিন্ন অবিস্মরণীয় কীর্তি সম্পন্ন করে, যা সমকালীন ইতিহাসের বিচারে হয়ে ওঠে অতুলনীয় আর সৃষ্টি করে অমর ঐতিহাসিক গৌরবগাথা।

লেখক: সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুজিবনগর

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বর্ণদুয়ার

আসাদুজ্জামান চৌধুরী

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একাত্তরের ১৭ই এপ্রিল এক অবিস্মরণীয় দিন। ইতিহাসের পাতায় চির ভাস্বর হয়ে রয়েছে এই দিনটি। বাঙালি জাতির আলোকবর্তিকা হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এই দিনে। এই সরকার গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধকালীন নয় মাস সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিচালনা করেছে দীর্ঘ নয় মাসের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। নিয়েছে দেশ গঠন ও উন্নয়নের জন্য বিশেষ ভূমিকা। বিপুল অস্ত্রভাণ্ডারে সজ্জিত দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণদান, অস্ত্র সংগ্রহ, কূটনৈতিক তৎপরতা বিষয়ক কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে পালন করেছে। ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেই পলাশীর আম্রকাননের ২৩ মাইল দূরে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামে (বৈদ্যনাথতলায়) বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিমূল রচিত হয়। সেইসঙ্গে রচিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন এক উজ্জ্বল ইতিহাস। নয় মাসের সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে গণরায় দেয়। গণরায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একাত্তরের ১লা মার্চ থেকে এদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে। একাত্তরের উত্তাল মার্চে সবকিছু চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। তিনি ছিলেন বাঙালির মহানায়ক ও অধিকর্তা। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দিলেন সেই কালজয়ী ভাষণটি। সেই ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে তিনি বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। রেসকোর্স ময়দানের এই ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু যে ডাক দেন, সেই ডাকেই বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। পরে ২৫শে মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনী নৃশংস গণহত্যা শুরু করে। সেই রাতে বাঙালি জাতি নির্ভয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই শুরু করে দেয়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হলো বাংলার প্রতিটি গ্রামগঞ্জে, শহরে-বন্দরে, বাজারে-ঘাটে লড়াই-প্রতিরোধ। এদিকে বাংলাদেশের আপামর জনতার একতার প্রতীক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলো।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ একাত্তরের ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় ফরিদপুর-কুষ্টিয়া পথে ভারতের পশ্চিম বাংলার সীমান্তে পৌঁছেন। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মী ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে ৩১শে মার্চ মেহেরপুর সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পদার্পণ করেন। এদিকে সীমান্ত অতিক্রম করার বিষয়ে মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী (বর্তমানে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা) তাঁদের সার্বিক সহায়তা করেন। সীমান্ত অতিক্রম করার পর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক কে এফ রুস্তামজী তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এবং বাঙালির স্বাধীনতা লাভের অদম্য স্পৃহা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। সীমান্তে পৌঁছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাজউদ্দীন আহমদ দেখেন যে, বাঙালি বিদ্রোহী সেনাদের সমর্থন ও বেসামরিক লোকদের খণ্ড খণ্ড প্রতিরোধ যুদ্ধের সমর্থনে কেন্দ্রীয় ভারত সরকার থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কিছুই করার নেই।

১৭ই এপ্রিল ১৯৭১, আনুষ্ঠানিক অভিবাদন গ্রহণ করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম–ফাইল ছবি

এ অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে দিল্লির পথে যাত্রা করেন তাজউদ্দীন আহমদ ও ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম। ৩রা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের প্রথমবারের মতো দেখা হয়। ৫ই এপ্রিল পুনরায় তাজউদ্দীন আহমদ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। সেদিন যে বিষয়সমূহ আলোচনায় স্থান পায় তা ছিল এমন: বাংলাদেশ সরকারকে ভারতে অবস্থানের অনুমতি প্রদান, সরকার পরিচালনায় সহায়তা আদায় ও বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক শেষে ভারতে উপস্থিত আওয়ামী লীগের এমএলএগণের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনসভায় মিলিত হন তাজউদ্দীন আহমদ।

একাত্তরের ১০ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দীন আহমদ এক ভাষণ দেন। জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি (রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) ও তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ঘোষিত হয়। এতে জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা রক্ষা, অসাম্প্রদায়িকতা, মানবিক মর্যাদাবোধ সমুন্নত রাখার জন্য সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অঙ্গীকার করা হয়। স্বাধীন

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে নির্মিত ভাস্কর্য

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভবের পটভূমি, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বৈষম্য ও বাঙালি জাতির বীরত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। লক্ষণীয় যে, একাত্তরের ২৬শে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণাটি কে দিয়েছিলেন তা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঁচ নম্বর প্যারায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে, '...বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন...।' বাংলাদেশ সংবিধানে এই ঘোষণাপত্র সন্নিবেশিত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সংবাদ ১১ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও আকাশবাণী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। তারপর দিল্লি কেন্দ্র ও বিবিসিসহ বিশ্বের অন্যান্য গণমাধ্যম এই সংবাদ প্রচার করে। এই সংবাদ অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ও মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে সাহস, আস্থা ও যুদ্ধ বিজয়ের মনোভাব তৈরি করে। বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধকল্পে আরো এগিয়ে আসে। কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে 'জয় বাংলা'। কানে বেজে ওঠে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী ভাষণের নির্দেশাবলি। সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে সর্বত্র। একাত্তরের ১১ই এপ্রিল ভারতের আগরতলায় এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, চুয়াডাঙ্গায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ ১৪ই এপ্রিল প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করবেন। এই সিদ্ধান্ত গণমাধ্যমে প্রকাশ লাভ করায় দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী চুয়াডাঙ্গায় প্রবল বোমা বর্ষণ করে। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয়, চুয়াডাঙ্গার পার্শ্ববর্তী মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলায় বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক শপথ নেবে।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের আম্রকাননের চারদিকে হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষের উপচে পড়া ভিড়। শপথের ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ধারণ করতে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকরাও প্রস্তুত। মুক্ত আকাশের নিচে চৌকি পেতে তৈরি করা হয়েছিল শপথ মঞ্চ। মঞ্চের ওপর সাজানো হয়েছিল ছয়খানা চেয়ার। নতুন রাষ্ট্রের নেতারা একে একে আসতে থাকেন। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে প্রকম্পিত চারদিক। প্রথম শপথ মঞ্চে উঠে এলেন বঙ্গবন্ধুর আজীবনের ঘনিষ্ঠ সহচর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাঁর পেছনে আরেক সহচর তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও কর্নেল (অব.) এমএজি ওসমানী। অনুষ্ঠানের সূচনায় পবিত্র কোরান তেলাওয়াত ও গীতা, বাইবেল পাঠ করা হয়। স্থানীয় শিল্পী ও হাজারো মানুষের কণ্ঠে গাওয়া হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' এরপর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম উত্তোলন করেন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা। এরপর সংসদীয় দলের চিফ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঐতিহাসিক দলিল 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করেন। তারপর তিনি নতুন সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীবর্গকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণের পর সশস্ত্র তেজোদীপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। শপথ গ্রহণ শেষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণে বলেন, 'আজ এই আম্রকাননে একটি জাতি জন্ম নিল। ...পৃথিবীর মানচিত্রে আজ নতুন রাষ্ট্রের সূচনা হলো– তা চিরদিন থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন 'মুজিবনগর'। তিনি জাতির উদ্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণার পটভূমি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, 'পাকিস্তান আজ মৃত। অসংখ্য আদম সন্তানের লাশের তলায় তার কবর রচিত হয়েছে। ... স্বাধীন বাংলাদেশ আজ একটি বাস্তব সত্য। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি অজেয় মনোবল ও সাহসের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার বাঙালি সন্তান রক্ত দিয়ে এই নতুন শিশু রাষ্ট্রকে লালনপালন করছেন। দুনিয়ার কোনো জাতি এ নতুন শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে না। আজ হোক, কাল হোক দুনিয়ার ছোটো-বড়ো প্রতিটি রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে এ নতুন জাতিকে। স্থান করে দিতে হবে বিশ্ব রাষ্ট্রপুঞ্জে।' স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মাধ্যমে শেষ হয় একটি প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ রাজনৈতিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন।

জাতি ১৭ই এপ্রিলকে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালন করছে। এই মুজিবনগর স্বাধীন বাংলাদেশের স্বর্ণদুয়ার। স্বাধীনতার কথা উঠলে এই স্বর্ণদুয়ারের অস্তিত্ব মানতে হবে। যথাযথ সম্মান দিতে হবে। একাত্তরের ২৬শে মার্চ ও ১৬ই ডিসেম্বরের মেলবন্ধন হচ্ছে ১৭ই এপ্রিল। মুজিবনগর সরকারের (প্রথম সরকার) দূরদৃষ্টি ও দক্ষতার ফলে মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে হলে মুজিবনগরের পুরো এলাকা ঘুরে দেখতে হবে। দেখলে মনে হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত ইতিহাস বুকে ধারণ করে আছে মুজিবনগর। সেইসঙ্গে বলতে হবে বাংলা, বাঙালি, মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর যেন অভিন্ন নাম বা সমার্থক শব্দ।

লেখক: শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামবাংলার বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য

শামসুজ্জামান শামস

বাঙালি জীবনে বৈশাখ আসে জীবন সংগ্রামের অফুরান প্রেরণা নিয়ে। আবহমান বাংলার হাজার বছরের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাঙালি বরণ করে নতুন বছরকে। শুধুই কি বাঙালি? বাংলা ভাষাভাষী ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জীবন-জগতে স্বপ্নময় নতুন বছরের শুভযাত্রা সূচিত হয় এই বৈশাখে। বৈশাখের প্রথম দিবসটি আবহমানকাল থেকেই আমাদের সত্তায়, চেতনায় ও অনুভবের জগতে এক গভীরতর মধুর সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করছে। বাঙালির জীবনে ঐতিহ্যের রং আর রূপ নিয়ে আসে পহেলা বৈশাখ। গোটাদেশ এদিন মেতে ওঠে উৎসব আয়োজনে। বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস হাজার বছরের। সমৃদ্ধ এই সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত গ্রামবাংলার অনেক ঐতিহ্য কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারার সঙ্গে এক সময় পলো, পালকি, হুক্কা, কলার পাতায় খাবার, বায়োস্কোপ, কলের গান, মটকা, যাঁতা, মাথাল, খড়ম, হারিকেন, কাঠের লাঙল, গরুর গাড়ির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল। একসময় গ্রামীণ জীবনে ঢেঁকি ছিল অত্যাবশ্যক অনুষঙ্গ। আমাদের মা-খালা, দাদি-নানিদের সঙ্গে ঢেঁকির গাঢ় সখ্য ছিল। এ প্রজন্মের অনেকেই বিলুপ্ত হওয়া ঐতিহ্যবাহী এসব অনুষঙ্গের কথা জানেই না। তাদের জন্য হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরা হলো।

ঢেঁকি

প্রাচীনকালে এই উপমহাদেশে ধানভানা বা শস্য কোটার জন্য ঢেঁকি ছিল একমাত্র অবলম্বন। ঢেঁকি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক গল্প-কবিতা এবং উপন্যাস রচিত হয়েছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, আমড়া কাঠের ঢেঁকি– ঢেঁকি নিয়ে এমনি অনেক প্রবাদও রয়েছে। ঢেঁকিতে ধান ভানার সময় গাঁয়ের নারীরা আনন্দে পালা করে

গান পরিবেশন করত। নানা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলত। মানুষ এখন আর ঢেঁকিতে ধান ভানে না। ধান ভানার কল এসে উঠিয়ে দিয়েছে ঢেঁকি।

চালের কল বা ধান ভানার আধুনিক যন্ত্রটি চালাতে বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। ঢেঁকিতে প্রয়োজন হতো শারীরিক পরিশ্রম। একখণ্ড পাথরের চটান বা কাঠখণ্ডে গর্ত খুঁড়ে মুষলের সাহায্যে শস্য কোটা হতো। মুষলটির মাথায় লোহার পাত জড়ানো থাকত। মুষলটি ৪-৫ হাত লম্বা একটি ভারী কাঠের আগায় জোড়া লাগিয়ে গর্ত বরাবর মাপে দুইটি শক্ত খুঁটির উপর পুঁতে রাখা হয়। শস্য কোটার জন্য ঢেঁকির গর্তে শস্য ঢেলে দিয়ে একজন বা দুজন ঢেঁকির গোড়ায় ক্রমাগত চাপ (পাড়) দিত। অন্যদিকে মুষলের আঁতের ফাঁকে ফাঁকে আরেকজন গর্তের কাছে বসে শস্যগুলো নাড়াচাড়া করত। এভাবে ঢেঁকিতে ধানভানা হতো। ঢেঁকিতে ধানভানা চালের ভাত খেতে ছিল সুস্বাদু। এই চালকে ঢেঁকিছাঁটা চাল বলা হতো। কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে ঢেঁকি।

সানকি

মাটির বাসনকে সানকি বলা হয়ে থাকে। এই সানকিই ছিল এক সময়কার ভাত খাবার পাত্র। মাটির সানকি পহেলা বৈশাখের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। এটা না হলে বৈশাখ পালন অনেকখানি অপূর্ণই থেকে যাবে বাঙালির কাছে। বৈশাখের সকালে সানকিতে করে পান্ড়া-ইলিশ না খেলে কি আর চলে? তাই অধিকাংশ লোকই কেনাকাটার তালিকায় প্রথমেই কিনে রাখেন মাটির সানকি। এ যুগে ডাইনিং টেবিলে অথবা প্লেট রাখার স্থানে মাটির বাসনের দেখা মেলাই কষ্ট। এখন দুই ধরনের সানকি বাজারে পাওয়া যায়। একটি প্লেটের মতো সমান এবং অপরটি একটু গোলাকার, যেটির আকৃতি হালকা বাটি ধরনের।

পালকি

আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারার সঙ্গে একসময় পালকির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তখনকার দিনে বিয়ে এবং পালকি ছিল একই সূত্রে গাঁথা। পালকির প্রচলন কবে, কোথায় শুরু হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে পালকি নিয়ে রচিত গান, ছড়া এবং কবিতা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে এর মিতালি হাজার বছরের। একদা এ দেশের জমিদার, নবাবসহ সমাজের শাসকশ্রেণি কোথাও যাতায়াত করলে

পালকিকে প্রিয় বাহন হিসেবে বেছে নিতেন। খাসমহল থেকে ঘোড়ার পিঠ বা পানসি নৌকা ঘাট পর্যন্ত যেতেও তারা পালকি ব্যবহার করতেন। এখন রাস্তায় যেমন বাহারি মডেলের গাড়ি রয়েছে ঠিক তেমনই ছিল বাহারি ডিজাইনের পালকি। সোনা, রুপা, লোহা এবং কাঠের মিশ্রণে তৈরি পালকি বা চতুর্দোলা ছিল তখনকার দিনের মানুষের আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলার মাধ্যম।

গ্রামীণ জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পালকি বিবর্তনের ধারায় হারিয়ে গেছে। যান্ত্রিক গাড়ির কারণে কেউ এখন আর পালকি ব্যবহার করে না। বিয়েশাদিতে কিংবা কন্যাকে বাবার বাড়িতে নাইয়র নিতে যে পালকির ব্যবহার ছিল এখন তা নেই। এটি এখন স্থান পেয়েছে জাদুঘরে। একসময় গ্রামে গ্রামে পালকি নিয়ে জমজমাট ব্যবসা ছিল। বিভিন্ন উৎসব, পার্বণ ছাড়াও নানা কারণে পালকি ব্যবহৃত হতো। সামনে দু'জন, পেছনে দু'জন করে চারজন মানুষ প্রয়োজন হতো পালকি বহনে। এদের বলা হতো বেহারা। অনুষ্ঠানের আগে বেহারাদের হাতে কিছু অর্থ বায়না বা অগ্রিম দিতে হতো। অনুষ্ঠানে তাদের জামাই আদরে খাওয়ানো হতো। বেহারা যখন পালকি কাঁধে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেত তখন তাদের মুখ থেকে বের হতো হরেক রকম গান। সময়ের আবর্তনে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। বিবর্তনের স্রোতে ভেসে গেছে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রিয় বাহন পালকি বা চতুর্দোলা।

কলার পাতায় খাবার

হারিয়ে গেছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য কলার পাতায় মজলিসি খাওয়া। এক সময় কলার পাতা ছিল মজলিস খাবারের প্রধান উপকরণ, যেখানে খাবার অনুষ্ঠান সে এলাকায় ৮–১০ দিন আগে থেকেই বিভিন্ন বাগানে

কলাপাতা কাটার ধুম পড়ে যায়। বর্তমানে ওয়ান টাইম প্লাস্টিকের প্লেট আর গ্লাস অতি সহজেই বাজারে পাওয়া যায়। ফলে কলার পাতার প্রচলন আর গ্রামবাংলাতেও নেই। এখন থেকে ২০-২৫ বছর আগে কলার পাতা ছাড়া কোনো মজলিসি খাওয়া হয়নি। মজলিসের দিন-তারিখ ঠিক হওয়ার ১০-১২ দিন আগে থেকেই এ গ্রাম ও গ্রাম, দূরদূরান্ত থেকে কলাপাতা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকত যুবকরা। এখন আগের মতো আর কলার পাতার প্রয়োজন হয় না। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, কলাপাতায় খাবার পরিবেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে একাধিক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ কলা পাতায় খাবার খাওয়ার সময় পাতার প্রাকৃতিক উপাদান আমাদের দেহের অন্দরে প্রবেশ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভেতর থেকে শরীর এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, কোনো রোগই ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না।

পলো

বাংলাদেশে বর্ষা শেষে হেমন্তের আগমনে খালবিল, জলাশয়ের পানি কমতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সব বয়সের মানুষ পলো, ঠেলা জাল নিয়ে খালবিল, ডোবা-নালা, নদনদীতে মাছ ধরতে নামে।

মাছ ধরা বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার বছর ধরে। অতীতে শীত এলে হাঁটু পানি শুকাতে থাকা খালবিলে মাছ শিকারের ধুম পড়ে যেত। গান গেয়ে, গ্রামের লোকেরা হইহল্লা করে পলো নিয়ে মাছ ধরতে নেমে পড়ত। অনেক গ্রামে ঢোল বাদ্য বাজিয়ে মাছ শিকারের উৎসবের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হতো। গ্রামের ছেলে, বৃদ্ধ–সবাই মিলে পলো নিয়ে মাছ ধরা উৎসবে যোগ দিত। তলাবিহীন কলসি বা মটকার আদলে বাঁশ ও বেতের সংমিশ্রণে ছোটো ছোটো ছিদ্র রেখে শৈল্পিক কারুকার্যের মাধ্যমে অত্যন্ত নিপুণভাবে মাছ ধরার যে যন্ত্রটি তৈরি করা হতো তাকে পলো বলে। পলো দিয়ে মাছ ধরাকে অনেক স্থানে পলো বাওয়াও বলে।

পলো দিয়ে মাছ ধরার কাজ ছাড়াও হাঁস-মুরগি ধরে রাখার কাজেও ব্যবহার করা হতো। শুকনো মৌসুমে বিশেষ করে পৌষ মাস থেকে শুরু করে চৈত্র মাস পর্যন্ত চলত পলো দিয়ে মাছ ধরার আয়োজন।

বায়োস্কোপ

বাংলার হারিয়ে যাওয়া এক ঐতিহ্যের নাম বায়োস্কোপ। এক সময় গ্রামবাংলার শিশুদের চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম ছিল বায়োস্কোপ। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে বায়োস্কোপ। গ্রামবাংলার সিনেমা হলো বায়োস্কোপ। কাঠ বা টিনের বাক্সের মধ্যে বসানো ছোটো ছোটো আয়নাযুক্ত ছিদ্রগুলোতে চোখ রাখলেই চোখের সামনে একে একে ভেসে উঠত মক্কা-মদিনা থেকে শুরু করে তাজমহল, মতিঝিল, বঙ্গবন্ধু, মহাত্মা গান্ধী, বাঘ, সিংহ, শাপলা

ফুলসহ আরো অনেক কিছু! সেই সাথে থাকত বায়োস্কোপওয়ালার উদ্ভট বেশভূষা এবং ডুগডুগির বাজনার তালে তালে ছবিগুলোর বর্ণনা গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মীগণ বায়োস্কোপ দেখিয়ে জনগণকে সচেতন করতেন।

রং-বেরঙের কাপড় পরে, হাতে ঝুনঝুনি বাজিয়ে বিভিন্ন রকমের আলোচিত ধারা বর্ণনা করতে করতে বায়োস্কোপওয়ালা ছুটে চলত গ্রামের স্কুল কিংবা সরু রাস্তা ধরে। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার মতো তার পেছন পেছন বিভোর স্বপ্ন নিয়ে দৌড়াত গ্রামের ছেলেমেয়েরা। বায়োস্কোপওয়ালার এমন ছন্দময় ধারা বর্ণনায় আকর্ষিত হয়ে ঘর ছেড়ে গ্রামের নারী-পুরুষ ছুটে আসত বায়োস্কোপের কাছে। একসাথে সবাই ভিড় জমালেও তিন কী চারজনের বেশি একসাথে দেখতে না পারায় অপেক্ষা করতে হতো। সিনেমা হলের মতো এক শো, এরপর আবার তিন বা চারজন নিয়ে শুরু হতো বায়োস্কোপ। 'কী চমৎকার দেখা গেল, রহিম-রূপবান আইসা গেল /ঢাকা শহর দেখেন ভালো, কী চমৎকার দেখা গেল'– এভাবেই নানারকম আকর্ষণীয় ধারাভাষ্য দিয়ে বায়োস্কোপওয়ালারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কালের বিবর্তনে হারিয়ে গেছে বাংলার বিনোদনের এই লোকজ মাধ্যমটি। টিভি আর আকাশ সংস্কৃতি স্যাটেলাইটের সহজলভ্যতার কারণে আপনা-আপনিই উঠে গেছে বায়োস্কোপ।

হুক্কা

কয়েকশ বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে হুক্কা ব্যবহৃত হয়ে আসছে ধূমপানের কাজে। আমাদের দেশে কয়েকশ বছর ধরে হুক্কা ব্যবহৃত হলেও কালের আবর্তে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। গুর ... গুর ... গুর ... চির চেনা হুক্কার এ শব্দ এখন আর শোনা যায় না। এক সময়ে গ্রামে গ্রামে হুক্কা বেশ জনপ্রিয় ছিল। গ্রামের বৈঠকখানাগুলোতে পালাক্রমে হুক্কা টানার দৃশ্য এখন বিরল। হুক্কা টানার আগে এর প্রস্তুত প্রণালি জটিল হওয়ায় এবং বিড়ি-সিগারেটের সহজপ্রাপ্যতায় হুক্কা বিলুপ্তির পথে প্রায়।

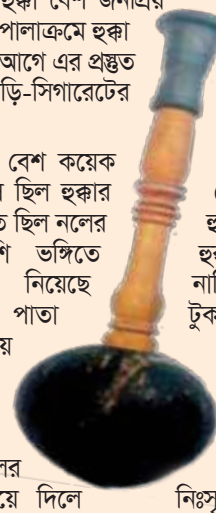

গ্রামীণ জীবনধারায় বেশ কয়েক বছর আগেও হুক্কার কদর ছিল। গ্রামের মানুষ ছিল হুক্কার নেশায় অভ্যস্ত। বিত্তবানদের বাড়িতে ছিল নলের হুক্কা। চেয়ারে গা এলিয়ে অর্থশালীরা আয়েশি ভঙ্গিতে হুক্কা টানত। এখন হুক্কার স্থান দখল করে নিয়েছে নামিদামি ব্র্যান্ডের সিগারেট। তামাক পাতা টুকরো করে কেটে এতে চিটাগুড় মিশিয়ে তৈরি হতো হুক্কার প্রধান উপাদান। এই উপাদানে যেখানে আগুন দেওয়া হতো তাকে বলা হতো কল্কি। এছাড়া নলযুক্ত নারিকেল বা পিতলের পাত্রে থাকত পানি। হুক্কার আগুন ধরিয়ে দিলে নিঃসৃত ধোঁয়া হুক্কার তলানিতে গিয়ে কুড়ুত কুড়ুত শব্দ করে বের হয়ে আসত।

বাংলাদেশে হুক্কা বিলুপ্তি হলেও সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই হুক্কা। দেশ-কাল-জাতি ভেদে হুক্কার বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- ওয়াটার পাইপ, হাবল-বাবল, শিশা, গজা, নারকিলা। হুক্কার ব্যবহার সিগারেট ব্যবহারের মতোই ক্ষতিকর। অনেকের ধারণা, হুক্কায় ধোঁয়া যেহেতু পানির ভেতর দিয়ে আসে তাই এটি সেবন তেমন ক্ষতিকর নয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় জানা গেছে, এক ঘণ্টা ধরে কোনো হুক্কা ব্যবহারকারী যে পরিমাণ ধোঁয়া টেনে নিচ্ছেন ভেতরে তা একজন সিগারেট ব্যবহারকারীর ব্যবহৃত একটি সিগারেট থেকে ১০০ থেকে ২০০ গুণ বেশি পরিমাণে ক্ষতি করে, ক্ষেত্র বিশেষে।

গরুর গাড়ি

আজ থেকে এক-দেড়শ বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশে গরুর গাড়ির বেশ কদর ছিল। এখন ধনাঢ্য ব্যক্তিরা পাজেরো, নিশান পেট্রোল, টয়োটা করলা গাড়ি হাঁকিয়ে যেমনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে তেমনি করে ১৮ শতকের ধনী ব্যক্তিরা গরু বা মহিষের গাড়িতে চড়ে আনন্দ বোধ করত। কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যেতে বসেছে প্রাচীন বাহন গরুর গাড়ি। এক সময় বাড়িতে অতিথি আসত পালকি বা গরুর গাড়িতে চড়ে।

আধুনিক যানবাহন আসায় এখন কেউ আর গরুর গাড়িতে চড়তে চায় না। এক সময় এই গরুর গাড়িতে চড়ে গাঁয়ের মেয়েরা বাপের বাড়িতে নাইয়র যেত। বিয়েতে বরযাত্রী যেত। যাতায়াত থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে গরুর গাড়ির কদর ছিল এক সময়। গরুর গাড়ি মূলত বাঁশের তৈরি। তবে কোনো কোনো অংশ যেমন- চাকা তৈরি হয় বাবলা কাঠ দিয়ে। এক জোড়া বড়ো সুঢোল চাকাই হলো এর অন্যতম প্রধান অংশ। এর উপরেই থাকে গরুর গাড়ির সব ভার। দুপাশে দুটি গরু জোয়াল কাঁধে গাড়ি টেনে চলে। যাত্রী বহনের গাড়িতে নৌকার মতো ছই থাকে। ছইয়ের ভেতরে বাত্তির ওপর পাটি বা বিছানা পেতে যাত্রীরা বসে থাকে। বাংলা সাহিত্যে গরুর গাড়ি এবং গাড়ির চালক গাড়িয়ালকে নিয়ে অনেক গল্প, কবিতা এবং গান রচিত হয়েছে। কিছুদিন আগেও গ্রামগঞ্জে মালামাল পরিবহণের প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ি। পল্লি বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি আজ বিলুপ্তির পথে।

কলের গান

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সবকিছু বদলাচ্ছে। এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। এক সময় ছিল কলের গানের যুগ। তারপর রেডিও, টেলিভিশন এবং বর্তমানে চলছে সিডি-ডিভিডির যুগ।

কলের গান আজ নেই। এখন আছে ডিস্ক প্লেয়ার। বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। কলের গান ছিল ছেলে, বুড়ো, নরনারী সকলের কাছে আকর্ষণীয় যন্ত্র। বিয়েশাদি, পূজা-পার্বণে আনা হতো কলের গান। যে বাড়িতে কলের গান ছিল অথবা বিশেষ উপলক্ষে আনা হতো, সেখানে ভিড় জমে যেত। গানের আকর্ষণে বসে থাকতেন শ্রোতারা। তেমনি আজকাল এ গানগুলো শুনলেই চল্লিশ ছুঁই ছুঁই যে-কোনো লোকের স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে একটি কাঠের বাক্স। মসৃণ কাঠের বাক্সটি (আধুনিক ব্রিফকেসের মতো) খুলতেই খট করে ঢাকনাখানি আনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যেত। বাক্সের ভেতরে গোলাকার পাইপের মতো একটি দণ্ড। মুখে পিন লাগানোর মতো খাঁজ। পাশে শুয়ে আছে হ্যান্ডেল। বাক্সের ভেতরের এক বড়ো অংশজুড়ে আছে গোলাকার চাকতি। এর উপর চিকচিকে মসৃণ প্লেটের মতো রেকর্ড বসিয়ে বাইরের দিকে হ্যান্ডেল লাগিয়ে দম দেওয়ার পর পর বাক্স থেকে ছড়িয়ে পড়ত সুরের লহরি: তোমারে লেগেছে এত যে ভালো চাঁদ বুঝি তা জানে, ... এর নাম কলের গান। আধুনিক জবানে গ্রামোফোন। আজকাল প্রায় বিলুপ্তির পথে কলের গান। এ উপমহাদেশ তথা বিশ্বের সংগীত অঙ্গনে কলের গানের অবদান অপরিসীম।

মটকা

আবহমান গ্রামবাংলায় এক সময় কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য মটকা ব্যবহৃত হতো। মটকা হচ্ছে মাটির তৈরি এক প্রকার বিশালাকৃতির পাত্র, যা দেখতে অনেকটা কলসের মতো মনে হয়। মটকায় রাখা চালে সহজে পোকা ধরে না এবং চালের গন্ধ ও স্বাদ দীর্ঘদিন অটুট থাকে। তাছাড়া মাটির তৈরি বলে এ জাতীয় পাত্রের সংস্পর্শে থাকার ফলে চালে কোনো ক্ষতিকারক উপাদান মিশে না। নদী এলাকায় বা হাওরাঞ্চলে সাধারণত বছরে একবার মাত্র ধান থেকে চাল করে সারাবছরের জন্য সংরক্ষণের তাগিদে মটকায় রাখা হতো। বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব এ পাত্রটি।

যাঁতা

আধুনিক যন্ত্রপাতির আদলে মানুষের জীবনযাত্রাও বদলে যাচ্ছে। সেইসাথে কালের আবর্তে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যাঁতা। যাঁতা হলো একপ্রকার হস্তচালিত যন্ত্র। গ্রামবাংলার বধূরা কিছুদিন আগেও চাল, গম গুঁড়ো করে আটা-ময়দা বের করতে ব্যবহার করত যাঁতা। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঢেঁকির সাহায্যে তা করা হতো। তবে অল্প পরিমাণে আটা বের করতে যাঁতা ব্যবহার করা হতো। এছাড়া যাঁতা দিয়ে ভাঙানো হতো মুসরি, খেসারি, মাসকলাইসহ বিভিন্ন রকমের ডাল।

বর্তমানে এটি ইঞ্জিনচালিত যন্ত্রের সাথে লাগিয়ে ডাল, চাল, হলুদ, মরিচ বা অন্য যে-কোনো কিছু গুঁড়া করতে ব্যবহার করা হয়। তবে

গ্রামাঞ্চলে যাঁতা বলতে এখনো হাতে এক খণ্ড কাঠি দিয়ে গোলাকৃতির চাকার মতো পাথরের যে যন্ত্রটি ঘুরিয়ে ডাল বের করা হয় তাকেই বোঝায়।

যাঁতা তৈরির মূল উপাদান পাথর। মসৃণ দুই খণ্ড পাথরকে কেটে গোল করে যাঁতা তৈরি করা হতো। সেই খণ্ড দুটির ভেতরের ভাগকে লোহার তৈরি বিশেষ বাটাল বা যন্ত্র দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চলা বা খাল করে এর ধার বাড়ানো হয়। উপরে এবং নিচের অংশের মাঝে গোল একটি ছিদ্র করা হয়। ছিদ্রে বিশেষভাবে কাঠের বা বাঁশ দিয়ে তৈরি হাতল লাগানো হয় যা দুই অংশকে এক জায়গায় থাকতে সাহায্য করে। দুই ছিদ্রের মাঝে বিশেষ খাঁজ কাটা দণ্ড থাকে যার সাহায্যে অংশ দুটির মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে তা নির্ধারণ করা হয়। শুধু উপরের অংশে আর একটি ফুটো করা হয়, যা দিয়ে শস্যকে ভেতরে পাঠানো হয় পিষার জন্য।

মাথাল

ক্ষেতখামারে কাজ করতে হলে রোদ আর বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়। তাই বাংলাদেশের কৃষকরা এ থেকে রক্ষা পেতে ব্যবহার করেন মাথাল। মাথাল হচ্ছে এক ধরনের মস্তকাবরণ। মাথালের অপর নাম মাতলা বা মাথাইল। এটি সাধারণত চাষি বা কৃষকেরা ব্যবহার করে। কিছু শ্রমিকও মাথাল ব্যবহার করে। শুধু বাংলাদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও মাথালের প্রচলন আছে। রোদ ও বৃষ্টি থেকে মাথা রক্ষার জন্য বাঁশের চটা, পাতা ইত্যাদি ব্যবহার করে মাথাল তৈরি করা হয়। কোনো কোনো দেশ বা অঞ্চলে নলখাগড়া দিয়েও মাথাল তৈরি করা হয়। মাথালকে কেউ বাঁশের টুপি আবার কেউবা বাঁশের ছাতাও বলেন। মাথাল থেকে পানি চোয়ানোর জো নেই।

খড়ম

খড়ম একপ্রকার কাঠের পাদুকা। কিছুকাল আগেও খড়মের শব্দে গৃহস্থরা বুঝতে পারতেন তাদের বাড়িতে কেউ আসছেন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় কাঠের তৈরি পাদুকা খড়ম এখন শুধুই স্মৃতি। কালের আবর্তে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কাঠের পাদুকা খড়ম। বাংলাদেশে খড়মের ব্যবহার অনেক প্রাচীন। একখণ্ড কাঠ পায়ের মাপে কেটে খড়ম তৈরি করা হয়। সম্মুখভাগে একটি বর্তুলাকার কাঠের গুটি বসিয়ে দেওয়া হয় যা পায়ের বৃদ্ধাঙুলি ও পাশের আঙুলটি দিয়ে আঁকড়ে ধরা হয়। এটি পরিবেশবান্ধবও।

হারিকেন

গ্রামীণ জনপদের মানুষের কাছে এ ক স ম য় হারিকেনই ছিল একমাত্র আলোর উৎস। গ্রামের অন্ধকার রাতে হারিকেনের আলো জ্বালিয়ে মানুষের পথ চলা এখন শুধুই স্মৃতি। হারিকেন জ্বালিয়ে গৃহস্থালি কাজসহ বাড়ির উঠানে বা বারান্দায় লেখাপড়া করত ছেলেমেয়েরা। অন্ধকার রাতে পথ চলতে ও হাটবাজারগুলোতে ব্যবহৃত হতো হারিকেন। গ্রামের প্রতিটি ঘরে হারিকেনের কেরোসিন তেল আনার জন্য গৃহস্থ বাড়িতেই ছিল কাচের বিশেষ ধরনের বোতল। সেই বোতলের গলায় রশি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো বাঁশের খুঁটিতে। অতীতে রিক্সা ও ভ্যানগুলোর নিচে রাতের আঁধারে হারিকেনের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। এখন সেখানে স্থান করে নিয়েছে চার্জার লাইট। বিদ্যুৎ না থাকলেও অবশিষ্ট সময় মানুষ ব্যবহার করছে আইপিএস, সোলারসহ বিভিন্ন ধরনের চার্জার লাইট। গ্রামবাংলায় সাধারণ মানুষের কাছে হারিকেনের কদর হারিয়ে গেলেও নিভৃত পল্লিতে এখনো অনেকে আঁকড়ে ধরে আছে হারিকেন স্মৃতি। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে উন্নত জীবনযাপন প্রণালির কারণে দিন দিন মানুষের মাঝে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলে এক সময়ের অন্ধকার দূর করার একমাত্র অবলম্বন হারিকেন আজ বিলুপ্তির পথে।

কাঠের লাঙল

মাটির সাথে চাষির রয়েছে আজন্ম সম্পর্ক। এক সময় চাষাবাদের অন্যতম উপকরণ ছিল কাঠের লাঙল। লাঙল ছাড়া চাষাবাদের কথা চিন্তাই করা যেত না। বাংলাদেশের কৃষকদের চাষাবাদে ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী কাঠের হাতল ও লোহার ফাল বিশিষ্ট কাঠের লাঙল আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। দেখা যেত, খুব ভোরবেলায় কৃষক তার ঘাড়ে লাঙল, জোয়াল আর মই রেখে একহাতে গরু শাসনের পাচুনি লাঠি আর অন্য হাতে চাষাবাদের উপযুক্ত দুটি ষাঁড়ের দড়ি ধরে মাঠে যাচ্ছে। কৃষিকাজে লাঙলের ব্যবহার পরিবেশবান্ধব এবং গ্রামবাংলার ঐতিহ্যও বটে। এদেশের কৃষকরা এক সময় কৃষিকার্যে লাঙল, জোয়াল, মই ও বলদ ব্যবহার করত। চাষাবাদের এসব উপকরণ মানুষ হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু কালের বিবর্তনে এসবের ব্যবহার আজ কমে গেছে, তার বদলে জায়গা করে নিয়েছে আধুনিক পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, ইঞ্জিনচালিত ধানমাড়াই যন্ত্র।

লেখক: সাংবাদিক, দৈনিক ভোরের কাগজ

মুজিবনগর

বাংলাদেশের আদর্শ ও চেতনা

রফিকুর রশীদ

সাধারণ অর্থে মুজিবনগর একটি স্থাননাম। শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা ভারতবর্ষেই ব্যক্তিনামের পরে 'নগর', 'পুর' প্রভৃতি শব্দ যুক্ত হয়ে স্থাননাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকে। মুজিবনগর তেমনই একটি দৃষ্টান্ত। স্থাননাম। প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে– স্থানটি কোথায় অবস্থিত? উত্তরও আছে খুব সহজ– বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত জেলা মেহেরপুরের দক্ষিণে এই মুজিবনগরের অবস্থান। অতি সাধারণ ছায়া সুনিবিড় এক পল্লিপ্রান্তর। মুসলিম পরিবারে ব্যক্তিনাম হিসেবে 'মুজিব'- এর সঙ্গে 'নগর' যুক্ত হবার ফলে সৃষ্টি হয়েছে স্থাননাম মুজিবনগর। একই নামে একাধিক স্থানের অস্তিত্ব থাকার দৃষ্টান্ত বহু আছে, কিন্তু এই মুজিবনগর সারাদেশে একটিই। এই অসাধারণ নামকরণের আগে এই স্থানটির নাম ছিল বৈদ্যনাথতলা। ব্যক্তিনামের শেষে 'তলা', 'তলি' যোগ করে স্থাননামে রূপান্তর ঘটানো নতুন কিছু নয়। সমগ্র ভূ-ভারতে বৈদ্যনাথতলা নামের একাধিক স্থানের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মুজিবনগর একটিই।

মেহেরপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলের ছায়া সুনিবিড়, শান্ত, নিস্তরঙ্গ, অখ্যাত, অজ্ঞাত সাধারণ পল্লিগ্রাম বৈদ্যনাথতলা এবং এই গ্রামের বিশাল আম্রকানন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মলগ্নে পালন করে ধাত্রীপনার পবিত্র দায়িত্ব। সময়টা ছিল ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদ এই দিনে বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে দেশি-বিদেশি শতাধিক সাংবাদিক ও স্থানীয় জনসাধারণের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে, শপথ গ্রহণ করে, গার্ড অব অনার গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ্যে পাঠ করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে অল্প সংখ্যক যে কয়েকটি মুক্তিকামী জাতি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে আইনসিদ্ধ করে নিয়েছে, বাঙালি তাদের মধ্যে অন্যতম। বৈদ্যনাথতলায় অনুষ্ঠিত এইসব ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় যে মহান নেতার নামে, তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই পরাধীন বাঙালি জাতির ঘুম ভাঙিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শৈল্পিক প্রক্রিয়ায় দাঁড় করিয়েছেন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে। স্বাধীনতার রূপকার এই নেতার নামেই সারাদেশের মানুষ কণ্ঠ ছেঁড়া স্লোগান দিয়েছে, 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব।' 'মুজিব' শব্দটি সেই অগ্নিগর্ভ সময়ে হয়ে ওঠে শক্তি, সাহস, শৌর্য আর প্রেরণার প্রতীক। বৈদ্যনাথতলার ছায়াঘন আমবাগানে ইতিহাসের বাক পরিবর্তনকারী এইসব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলেছে হিমালয়সদৃশ যে মহান ব্যক্তিত্বের নামে, বাস্তবে তিনি কিন্তু উপস্থিত নেই সেখানে, নেই মানে শারীরিকভাবে নেই। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই পাকিস্তানের বর্বর সৈনিকেরা ধানমন্ডির বাড়ি থেকে তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যায় (কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে খবর দেশের মানুষ তখনও জানে না), তবে তিনি জেগে ছিলেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির অন্তরের গভীরে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার উজ্জ্বল বেদিতে। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত গণপরিষদ সদস্য, সুধী, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে ৩০ মিনিটব্যাপী উদ্দীপনাময় এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষে আবেগঘন কণ্ঠে ঘোষণা দেন– আজ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হবে এই বৈদ্যনাথতলায় এবং এর নতুন নাম হবে মুজিবনগর।

এই মুজিবনগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম যে সরকার শপথ গ্রহণ করে, শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সেই সরকার গঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নামেই। তিনিই সরকার প্রধান, মহামান্য রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর ভাষণের শুরুতেই বলেন, 'আজ এই মুজিবনগরে একটি নতুন স্বাধীন জাতি জন্ম নিল।' এরপর মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং সবশেষে প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'আজ না জিতি, কাল জিতব; কাল না জিতি, পরশু জিতবই'।

দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে এদেশের মানুষ যখন বিপর্যস্ত, বিপন্ন, কর্তব্যবিমূঢ়, দিশেহারা প্রায়, সেই ক্রান্তিলগ্নে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার গঠন, দেশের মুক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই সরকারের শপথ গ্রহণ, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ এবং নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উদ্দীপনামূলক ও পথ নির্দেশক ভাষণ দান এবং সর্বোপরী মুজিবনগরকে রাজধানী ঘোষণা দেশবাসীকে শুধু আশ্বস্ত করে তাই নয়, আকাশ-সমান মনোবল নিয়ে দখলদার শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাবারও প্রেরণা জোগায়।

বস্তুতপক্ষে মুজিবনগরের নামেই ১৭ই এপ্রিলের পর থেকে চলেছে বাংলাদেশের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসন, চলেছে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগরের নামেই আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহানুভূতি সংগৃহীত হয়েছে, শেষ পর্যন্ত বিজয়ও অর্জিত হয়েছে এই নামেই। সেসময় সারাদেশেরই অন্য নাম হয়ে ওঠে মুজিবনগর। আমার বিবেচনায় মুজিবনগর হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশের সিংহদুয়ার। মুজিবনগর অধ্যায়কে পাশ কাটিয়ে যারা এদেশে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে যেনতেন প্রকারে শামিল হতে চায় তাদের অন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের কোনো ছায়াপাত নেই, তারা যেন-বা হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই স্বাধীনতার বাঁশি বাজছে শুনতে পায়। আন্দোলন-সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে দেশের মানুষের অন্তরে যে স্বপ্ন ফুটে ওঠে, যে আদর্শ মানুষকে জীবন-মরণ লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করে, সেইসব স্বপ্ন আদর্শের সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। অথচ একটু পেছনে তাকালে আমরা দেখতে পাই– দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সংগ্রামে অনেকাংশে অসংগঠিত পারস্পরিক সম্পর্ক ও শৃঙ্খলাবিহীন এবং একক কমান্ডের নিয়ন্ত্রণহীন হবার কারণে যখন বিপর্যস্ত প্রায়, ঠিক তেমনি সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ এবং সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ তৎপরতাকে সেই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে সুপরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে দেশমাতাকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে ১৭ই এপ্রিলের অঙ্গীকার ঘোষণা, বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও গৌরবময় ঘটনা। সেদিন মুজিবনগরে এই যুগান্তকারী ঘটনা না ঘটলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নই হয়ত ভূলুণ্ঠিত হতো। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্বই দাঁড়িয়ে আছে মুজিবনগরের ভিত্তির ওপরে। সেদিন সেই ঐতিহাসিক লগ্নে মুজিবনগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে দীর্ঘকালের শোষিত বঞ্চিত বাঙালি জাতির সার্বিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছিল বলেই ওই ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে নির্ধারিত হয়ে যায় আগামী দিনে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রূপরেখা-আদর্শ-চারিত্র্য কেমন হবে। অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্নবীজ অঙ্কুরিত হয় ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এই মুজিবনগরেই। সেই অর্থে মুজিবনগর কেবলমাত্র স্থাননামই নয়, স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মৌলিক আদর্শ ও চেতনার অন্যনাম।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গাংনী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ২২শে মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশপত্রের রেপ্লিকা তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত–পিআইডি

উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় বাংলাদেশ

শ্যামল দত্ত

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এ পি জে আবদুল কালাম দেশের তরুণদের উদ্দেশে প্রায়ই বলতেন, যা তুমি ঘুমিয়ে দেখ সেটা স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। আর তাই স্বপ্ন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে।...

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ধ্বংসবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কঠিন সংগ্রামের মধ্যেও এদেশের মানুষকে 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজও শুরু করেছিলেন। দরিদ্র কৃষকের কথা বিবেচনা করে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে শুরু হয়েছিল কৃষি খাতে 'সবুজ বিপ্লব'। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূল স্তম্ভ ঘোষণা করে মাত্র ১১ মাসের মধ্যে তিনি জাতিকে সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের মধ্য দিয়ে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেছিলেন দেশ গড়ার নতুন সংগ্রামে। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন চালু করে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু, ১১ হাজার প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণের আওতায় এনে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হয়েছিল। ১৯৭৫-এ স্বাধীনতা দিবসের জনসভায় বঙ্গবন্ধু দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন, ক্ষেতখামার ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য গড়ার আহ্বান জানিয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন।

২০০৮ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনি ইশতাহারে জাতিকে আবার দিন বদলের স্বপ্ন দেখালেন। এই স্বপ্ন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে মধ্যম আয়ের এক সমৃদ্ধ দেশ গড়া ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এই লক্ষ্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের বিবেচনায় বিশ্বব্যাংক এই শ্রেণি নির্ধারণ করে থাকে। জাতিসংঘ দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত (Least Developing Country 'LDC'), উন্নয়নশীল (Developing) এবং উন্নত (Developed)–এই তিন পর্যায়ে বিবেচনা করে। এবার স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকেও বেরিয়ে আসছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সম্প্রতি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে। এজন্য বাংলাদেশকে তিনটি নির্ণায়ক পূরণ করতে হয়েছে। তা হলো: গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় (Gross National Income 'GIN'), মানবসম্পদ সূচক (Human Assets Index 'HAI') ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি সূচক (Economic Vulnerability Index 'EVI')।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের মানদণ্ড অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে বছরে একটি দেশের মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১,২৩০ মার্কিন ডলার হতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১,৭৫২ মার্কিন ডলার (বিবিএস)। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ পয়েন্ট প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ ৭২.৯ পয়েন্ট অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ ভাগের কম হতে হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সূচক ২৪.৮ ভাগ। এর আগে বাংলাদেশ তিনবার ব্যর্থ হলেও এবার উন্নয়ন সূচকের সব যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের অগ্রগতি ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় পর্যালোচনা করা হবে। সেসময় উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি এবার লাওস ও মিয়ানমারও স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

১৯৭৫ সাল থেকে জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত এলডিসি দেশের তালিকায় ছিল বাংলাদেশ। ২০১৮ সালের মার্চ মাসে দেশটি উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করে। ১৭ই মার্চ ২০১৮ (নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় ১৬ই মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায়) জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) এই স্বীকৃতিপত্র জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেছে। নিউইয়র্কে ত্রিবার্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সিডিপি।

যেসব দেশের অর্থনীতি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী কিন্তু উন্নত দেশের সমপর্যায়ের নয়, তারা নব শিল্পাঞ্চলভিত্তিক

দেশ বা উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত। উন্নয়নশীল দেশ বোঝাতে নানা পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। পরিভাষাগুলোর মধ্যে রয়েছে– অল্পতর উন্নত দেশ (LDC) বা অল্পতর অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ (LEDC) এবং আরো চূড়ান্ত ক্ষেত্রে, ন্যূনতম উন্নত দেশ (LDC) বা ন্যূনতম অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ (LEDC)। একটি স্বল্পোন্নত দেশ সংজ্ঞায়িত যে বিষয়গুলোর মাধ্যমে তা হলো: মানুষের কম আয়ু, কম শিক্ষা, কম টাকা আয়।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ অনেক আগে সক্ষমতা অর্জন করেছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ২০২১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। বর্তমানে বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর। অথচ প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানে এই হার ৬৬ বছর। অন্যদিকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশে প্রতি হাজারে ৩৫ জন। ভারতে তা প্রতি হাজারে ৫৫ এবং পাকিস্তানে ৬৬ জন। গত প্রায় এক দশকে উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬১০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪১.৫ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপির আকার ছিল ৪ লাখ ৮২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ১৯ লাখ ৭৫ হাজার ৮১৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৫.৪ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২৮% এবং বর্তমানে ৭.৬২% হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ১২.৩ শতাংশ। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি ৫.৮৪ শতাংশে নেমে আসে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল ০.৭৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ হয় প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে বাজেটের আকার প্রায় ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা। সে সময় এডিপি'র আকার ছিল ১৯ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এডিপি'র আকার ১ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৩৪.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ৩৩.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ২০০৫ সালে ২ লাখ ৭০ হাজার মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়। ২০১৭ সালে বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে ১০ লাখ ৮ হাজার ১৩০ জনের। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স ২০০৫-০৬ বছরে ছিল ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রেমিটেন্স এসেছে ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গত ৯ বছরে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। ১ হাজার ৪৫৮টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে। ৫০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৭২.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সারাদেশে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪ হাজার ৪৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। ৩০ প্রকার ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বিনামূল্যে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে। ১১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৬ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। শতকরা ৮৩ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হবে। খাদ্য উৎপাদন ৪ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। চাল ও মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয়।

সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বন্ধ কারখানা চালু করা হয়েছে। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত হচ্ছে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ 'পদ্মা বহুমুখী সেতু'। ঢাকায় মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। সমগ্র বাংলাদেশকে রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে। ঈশ্বরদীর রূপপুরে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম পরমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। খুব শিগগিরই 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণ করা হবে। পটুয়াখালীতে গড়ে উঠছে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর 'পায়রা সমুদ্রবন্দর'। গ্রিডবিহীন এলাকায় ৪৫ লাখ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সঞ্চালনের কাজ শুরু হয়েছে। গ্যাসের সমস্যা দূর করতে এলএনজি আমদানি শুরু হচ্ছে। রান্নার জন্য দেশে এলপিজি গ্যাস উৎপাদনের কাজ শুরু করা হয়েছে। সারাদেশে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীত করা হয়েছে। চন্দ্রা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নয়নের কাজ চলছে।

ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে সমুদ্র সম্পদ আহরণ, গবেষণা ও উন্নয়নে ব্লু-ইকোনমি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্রহণ করা হয়েছে বহুমুখী কর্মসূচি। হতদরিদ্র ৩৫ লাখ মানুষকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দুস্থ নারী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১২ লাখ ৬৫ হাজার। ৮ লাখ ২৫ হাজার জন প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছে। ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষা ভাতা পাচ্ছে। সারাদেশে ২ কোটি ২৮ লাখ ১৩ হাজার ৪৭৭ জন কৃষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ৯৮ লাখ কৃষক ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে ভরতুকির টাকা পাচ্ছে। প্রাইমারি থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি পর্যন্ত ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থী বৃত্তি ও উপবৃত্তি পাচ্ছে। ১ কোটি ৩০ লাখ প্রাইমারি শিক্ষার্থীর মায়ের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি ৩৭ লাখ ৭ হাজার।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এদেশের মানুষের জীবনমানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দেশে ১৩ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ৮ কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করে ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধি করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেখান থেকে জনগণ ২০০ ধরনের সেবা পাচ্ছে। সব ধরনের সরকারি ফরম, জমির পর্চা, পাবলিক পরীক্ষার ফল, পাসপোর্ট-ভিসা সংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষা, আইনগত ও চাকরির তথ্য, নাগরিকত্ব সনদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রক্রিয়া, বিষয়সহ বিভিন্ন বিল প্রদানের সুবিধা পাচ্ছে জনগণ। ঘরে বসে আউটসোর্সিং-এর কাজ করে অনেক তরুণ-তরুণী স্বাবলম্বী হয়েছে।

এদিকে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য দলিলে স্থান পাওয়ায় বাংলাদেশ বিশ্বসভায় সম্মানিত হয়েছে। যে বাংলাদেশকে একসময় করুণার চোখে দেখা হতো, সাহায্যের জন্য হাত বাড়ানোর জন্য করুণার পাত্র মনে করা হতো, আজ সেই বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। বাংলাদেশ জেন্ডার সংশ্লিষ্ট এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্বে ৫ম স্থান অর্জন করেছে। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'– জাতির পিতার এই আদর্শ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল প্রতিপাদ্য। এই নীতি অনুসরণ করে আজ প্রতিবেশী দেশগুলোসহ সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ এবার তার লক্ষ্য স্থির করেছে যে, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। আর এভাবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সত্যিকারের 'সোনার বাংলাদেশ'।

লেখক: প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা

সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা

বীরেন মুখার্জী

বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। ব্রিটিশদের ২০০ বছরের শাসন ও পাকিস্তানের ২৪ বছরের শোষণের পর বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রাক্কালে পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো আর শূন্য ভান্ডার নিয়ে যাত্রা শুরু করা স্বাধীন বাংলাদেশ এখন আর সেই অবস্থায় নেই। ইতোমধ্যে জাতিসংঘের তিনটি শর্ত পূরণ করে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রাথমিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিপুল জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আগামী দুই দশকের মধ্যে বিশ্বে দাতাদেশ হওয়ারও স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নির্দেশনায় বিশ্বব্যাংকের মানদন্ডে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উঠে আসে। অর্থনীতির আকারের দিক থেকেও বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৪৩তম, আর ক্রয়ক্ষমতা বিবেচনায় বিশ্বের ৩৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রাইস ওয়াটার কুপার হাউস (পিডব্লিউসি) বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৮তম বড়ো অর্থনীতির দেশ, ২০৫০ সালে আরো পাঁচ ধাপ এগিয়ে আসবে ২৩ নম্বরে। একাত্তরে স্বাধীনতা ঘোষণার পর ৯ মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সহায়-সম্বলহীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাঙালি জাতিকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসে নানা চড়াই-উতরাই পার করে সেই দেশটিকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট আছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এতদিন এশিয়ার টাইগার বলতে হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকে বুঝাতো। বর্তমানে এসব দেশের বাইরে এশিয়ার আরেকটি ইমার্জিং টাইগার বাংলাদেশ। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম প্রকাশিত 'ইনক্লুসিভ ইকোনমিক ইনডেক্সে' এর সাক্ষ্য মিলেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের এই অগ্রগতি নিয়ে প্রশংসা করেছেন বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম। তিনি বাংলাদেশকে উন্নয়নের 'রোল মডেল' বলেছেন। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুও বাংলাদেশকে দারিদ্র্য দূর করে উন্নয়ন অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় বলে উল্লেখ করেছেন। একসময় বাংলাদেশকে নিয়ে তাচ্ছিল্য করা পশ্চিমা অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদরাও এখন উন্নয়নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' গড়ার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তা এখন কথার কথা নয়, বাস্তবেই দেখতে পাচ্ছে দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীও।

একথা সর্বজনবিদিত যে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে ভুল বলেছিলেন, বছর কয়েক আগে বাংলাদেশ সফরকালে তা স্বীকারও করেছেন দেশটির আরেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি। ১৯৭৬ সালে 'বাংলাদেশ: এ টেস্ট কেস ফর ডেভেলপমেন্ট' নামে বই লিখে নরওয়ের অর্থনীতিবিদ Just Faaland ও ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ J.R Parkinson বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ কোনোদিন উন্নতি করতে পারবে না। আর বাংলাদেশ যদি উন্নতি করতে পারে, তাহলে দুনিয়ায় আর কোনো গরিব দেশ থাকবে না।' অবশ্য ২০০৭ সালে এই দুই অর্থনীতিবিদও নিজেদের ভুল স্বীকার করে বলেছেন, 'বাংলাদেশ সীমিত, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি করছে।' শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সাধারণ জনগণ বিশ্ববাসীকে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে যে, সঠিক দিকনির্দেশনা আর আন্তরিকতা থাকলে উন্নয়নের পথের প্রতিবন্ধকতা স্থায়ী হতে পারে না।

তথ্য অনুযায়ী, মাত্র ৪ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার অর্থনীতি নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের। প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বাধীনতার ছোঁয়া এবং দেশের মানুষের অদম্য স্পৃহা এ দেশকে গড়ে তুলেছে তিলে তিলে– এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা এখন আর উচিত নয়। স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম বাজেটের আকার ছিল ৭৮৬ কোটি টাকা, এখন ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন করছে সরকার। দারিদ্র্যের হার ৮৮ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে নেমেছে। আমদানির পরিমাণ ২২৬ কোটি ৪৪ লাখ টাকা থেকে দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৮১ হাজার ৫৫২ কোটি টাকায়। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ২৬০ কোটি টাকা, এখন বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৮২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকা। মাত্র ৮০ লাখ ডলারের রেমিটেন্স ৪৭ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৭৭ কোটি ডলারে। ২ কোটি ডলারের রিজার্ভ এখন ৩ হাজার ৩৩৭ কোটি ডলার। স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ২.৭৫ শতাংশ, এখন ৭.৬২ শতাংশ। তবে এই উন্নয়ন যাত্রাকে টেকসই করতে মানবসম্পদের উন্নয়ন ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য কমানোসহ বেশকিছু বিষয়ে জোর দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। তারা বলছেন, বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রাণশক্তি। ফলে নানা বৈষম্য কমাতে হবে। সুশাসন নিশ্চিত করে দেশেই বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে।

মহান স্বাধীনতার ৪৭ বছর পার করেছে বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলনেরও ৬৬ বছর পার করেছি আমরা। নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতাও আমরা রক্ষা করে চলেছি। আমাদের চেষ্টা ও আন্তরিকতার কমতি নেই। স্বাধীনতা লাভের ৪৭ বছর পর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বেরিয়ে আসার স্বীকৃতি পেল। এর ফলে জাতিসংঘের বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশের পথে যাত্রা শুরু করল বাংলাদেশ।

একথা সত্য, বর্তমান সরকার কৃষক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে, জেলা পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, হাতিরঝিল প্রকল্প, গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ি, বনানী, মগবাজার ফ্লাইওভারসহ বেশ কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর তৃতীয় স্প্যান বসানো হয়েছে। পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান। আগামীতে জনগণকে সঙ্গে নিয়েই প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যেতে হবে সরকারকে। ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে পূর্বেকার কাজের ও নানা ধরনের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের।

লেখক: সহসম্পাদক, সম্পাদকীয় বিভাগ, দৈনিক যায়যায়দিন

বৈশাখের আনন্দ কাব্য

জাকির আবু জাফর

বৈশাখ আমাদের জীবনকে নতুন করে জাগিয়ে দিয়ে যায়, জাগিয়ে দেয় নতুন আনন্দে, নতুন বৈশিষ্ট্যে এবং নতুন সুন্দরে। প্রকৃতির এ জাগরণ আজ কিংবা কালের নয়। নয় কোনো সাম্প্রতিক অতীতের। বরং এর প্রবাহ চিরকালীন। চির সময়ের হাত ধরে বৈশাখ আসে আমাদের কাছে। প্রকৃতির সর্বত্র এবং সবুজ বাংলাদেশময়। বৈশাখের স্পর্শে যেন আনন্দের কোলাহল জেগে ওঠে সারাদেশের সর্বত্র। এক প্রাণচাঞ্চল্যে দুর্দমনীয় গতির ঘোড়ায় আসে বৈশাখ। এসেই সর্বদিকে তোলপাড় করে। বৃক্ষ থেকে বাতাস পর্যন্ত অন্যরকম দোলায় দুলতে থাকে। প্রকৃতির সকল কিছু যেন ব্যস্ততায় মেতে ওঠে। এলায়িত অবয়বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন স্বাগত জানায় বৈশাখি নব আনন্দের দিনকে।

মানুষ পরিবর্তন ভালোবাসে খুব। এক জায়গায় কিংবা এক রকমের গতি মানুষের সয় না। নিত্যদিন মানুষেরা নতুনের সন্ধান করে। মানুষের এ চাওয়াও চিরকালীন। প্রতিটি দিনকে মানুষ আলাদা করে দেখতে ভালোবাসে। আলাদা আয়োজনে উদ্‌যাপন করতে চায় জীবনের প্রতিটি সকাল। যেভাবেই হোক মানুষের জীবনের প্রতিটি দিন আলাদা। প্রতিটি সকাল আলাদা। প্রতিটি দুপুর কিংবা সন্ধ্যা অথবা রাত আলাদা। গতকালের সমস্ত বৈশিষ্ট্য গতকালই নিয়ে যায়। চলে যায় অতীত নামক মহা সমুদ্রের দিকে। আজ যা ঘটে তা আগামীকাল কিছুতেই ঘটে না। এভাবে মানুষের জীবনে বদলে যায় সব। নতুন হয়ে আসে সব কিছু। বৈশাখ সেই নতুনকেই আহ্বান জানায়। সেই বদলকেই নিয়ে হাজির হয়। আমাদের জাতীয় কবির উচ্চারণে তারই দুর্দান্ত প্রতিধ্বনি শুনি–

ঐ নূতনের কেতন ওড়ে
কালবোশেখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

এই যে নূতনের কেতন ওড়ে এটাই আনন্দের। এটাই উৎসাহের। এটাই সাহসের। সাহসই মানুষকে নতুন পথে তুলে দিতে সাহায্য করে। নতুনের জয়গানে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষ গায়। নতুন করেই গায়। হোক পুরোনো গান কিন্তু কণ্ঠে বাজে নতুন করেই। নতুনের এই চির চেতনার ধ্বনি বৈশাখে তাই যেন প্রকাশিত হয়।

বৈশাখ চিরকালই চঞ্চলা। হাটে-ঘাটে-মাঠে বনানির বক্ষে কিংবা নদী-সমুদ্রের বুকে সর্বত্র সে চাঞ্চল্যের ঘোড়া লাফিয়ে ছুটতে থাকে। বৈশাখি ঘোড়ার এ চলন মনুষ্য সমাজে চিরকাল দারুণ কৌতূহলের। দারুণ ঔৎসুক্য নিয়ে মানুষ বরণ করে বৈশাখের আনন্দময় সকালকে। এমন সকাল সারাবছর কি আসে! না আসে না। আসতে পারে না। পারে না কারণ বছরতো একবারই শুরু হয়। শুরু হয়েই সে প্রথম থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় এবং তৃতীয় থেকে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এভাবে পুরোনো হতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সময় কি কখনো পুরোনো হয়। কখনো কি সে জরাজীর্ণতা গ্রহণ করে। সে কি জরাগ্রস্ত হয়! এ সকল জিজ্ঞাসার জবাব একটাই– না। কেননা সময়তো কখনো পুরোনো হয় না। সে চিরকালই নতুন হয়ে ফেরে। যে সূর্য দিন শেষে অস্ত যায় সে তো বৃদ্ধ হয়েই ডোবে। কিন্তু সকালবেলা যখন আকাশে তার রক্তময় চোখের আভাস দোলে তখন সে চির আনন্দের ভেতর চির যৌবনা হয়েই জেগে ওঠে। তার রোদের হাসি, তার আলোর তরঙ্গ, সবই নতুনের সুন্দরে মণ্ডিত। বৈশাখি সকালের সূর্যও সেই মহা আনন্দের বার্তা নিয়েই আসে। চির নতুনের আবহেই তার উদয় ঘটে। বৈশাখের সকাল বছরের প্রথম সকাল। সে গত বছরের সব লেনাদেনা চুকিয়ে নতুন হয়ে জেগে ওঠে। নতুন সৌরভে-গৌরবে স্পন্দিত হয়। নতুন স্পর্শের কম্পন থাকে তার সারা শরীরময়। তাকে বরণ করার বর্ণাঢ্য আয়োজন চলতে থাকে বেশ খানিকটা লম্বা সময় ধরে। বরণ করা হয় বেশ ঐশ্বর্যে। ঐশ্বর্যের ঔদার্য দেখি আমরা। নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, যুবক-যুবতী প্রত্যেকেই তাকে বরণের আনন্দে মাতে।

বৈশাখ বরণের এ উৎসব এককালে বেশ সীমিত ছিল। বলা যায়, গ্রামেগঞ্জে এ আবহটা ছিল বেশি। আর আজ? আজ কিন্তু গ্রাম থেকে শহরের আয়োজন হাজার গুণ বেশি। এতটা বৃহৎ আকৃতি ধারণ করেছে শহরের আয়োজনে তা যেন পরিমাপের বাইরে ছড়িয়ে গেছে। এই যে বৈশাখি উচ্ছ্বাস-উল্লাস একেও এক ধরনের জাগরণ বলা চলে। এটি এক ধরনের শক্তির উদ্‌বোধন। এ কারণেই বোধ হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর– এসো হে বৈশাখ এসো এসো, বলে স্বাগত জানিয়েছেন বৈশাখের আগমনকে।

বাংলাদেশ এক আশ্চর্য সবুজাভ প্রকৃতির দেশ। যেখানে বৃক্ষরা শীতের শেষ এবং বসন্তের শুরু ছাড়া প্রায় সারাবছর একই থাকে। শীতের শেষে বৃক্ষের পাতা ঝরে একথা ঠিক। কিন্তু সব বৃক্ষের পাতাকে শীতের দাপট কাবু করতে পারে না। কিছু কিছু বৃক্ষ আছে যেগুলোর পাতা বৈশাখেই ঝরে। ঝরতে ঝরতে আবার নতুন পল্লবে সজ্জিত হয়ে যায় বলে আমরা তাকে লক্ষ করি না। সে যাই হোক, সারাটি বছর যেখানে সবুজ আর সবুজের সমারোহ সেখানে ঋতুর বিবর্তন খুব একটা আমাদের কাবু করতে পারে না। আমরা তবু দেখি আমাদের এই শাশ্বত চিরন্তন সবুজের শরীরে ছয়টি ঋতু কম বেশি দোলা দিয়ে যায়। ঋতুগুলো যেন বেড়াতে আসে আমাদের প্রকৃতিতে।

আমরা গ্রীষ্মের দাবদাহ দেখি, বর্ষার অঝর বর্ষণের সিক্ততা দেখি। দেখি শরতের স্নিগ্ধ, কোমল শরীরের শিশির। হেমন্তের গাঢ় নীলের আশ্চর্য অখণ্ড আকাশ। শীতের কুয়াশাভরা মাঠের আশ্চর্য রহস্য। আর বসন্তের ফুলের বাঙ্ময় প্রকাশ। এভাবে ছয় ঋতু আমাদের আনন্দ দিয়ে যায়। বলে যায় শাশ্বত জীবনের কুশলতার কথা।

বৈশাখে এ কুশলতার সৌন্দর্য চেতনা বৃদ্ধি পায়। বেড়ে যায় গ্রহণের তৃষ্ণা। মানুষ পারস্পরিক আনন্দ বিনিময় করে। সাধ্যমতো নতুন জামা, জুতো সংগ্রহের ধুম পড়ে। ছোটো-বড়ো সকলেই এই উৎসবের সঙ্গী হয়ে যায়। সকলেই ভাবে নতুন বছরে নতুন করে পথ চলার স্বপ্নের কথা।

রমনার বটমূলে নতুন সূর্যের সান্নিধ্যে বেজে ওঠে বৈশাখের গান। এ গান আর থামতেই চায় না। ভোর ফোটার সাথে সাথে হাজার হাজার মানুষের পদভারে বিস্মিত হয় রমনার বুক। সারাবছর জুড়ে যত মানুষের বিচরণ না ঘটে বৈশাখের এক ভোরেই তার থেকে বহুগুণ বেশি লোকের পদভার আওয়াজ তোলে রমনায়। নারী-পুরুষ, ছোটো-বড়ো সকলেই গেয়ে ওঠেন এসো হে বৈশাখ... অথবা ঐ নূতনের কেতন ওড়ে...। এভাবে হাজারো কণ্ঠে একই ধ্বনির মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ে আকাশে-বাতাসে। রমনা এক বিশাল মিলন মেলা। এক অবাক করা উৎসবের সবুজ ভূমি। রমনার এ আনন্দ শুধু রমনায় সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের সর্বত্র। হাজারো মানুষের পদচারণা গণমাধ্যমের কল্যাণে বাংলাদেশতো বটেই পৃথিবীব্যাপী তার আশ্চর্য আবহ ছড়িয়ে পড়ে। দুনিয়াজুড়ে যত বাঙালি রয়েছেন তারা প্রত্যক্ষ করেন রমনার বৈশাখি উৎসব। শুধু গান বা সুরের মূর্ছনা নয়। রমনায় বসা মেলার রকমারি জিনিসের বৈচিত্র্যও রং ছড়ায়। সেই সাথে নানারকম খাবারের সুরভিত বাতাস যেন ক্ষুধার তাড়না বাড়িয়ে দেয়।

পান্তা আমাদের গ্রামীণ জীবনের সাধারণ মানুষের খাবার। যারা গরম ভাত খাওয়ার তরকারি বা সালুন জোগাড় করতে অসমর্থ। যারা গরম ভাতের আয়োজনে সময় ও খরচের ঝুঁকি এড়াতে চায়। যারা গরমের ভেতর পেট ঠান্ডা রাখার কৌশল হিসেবে পান্তা খায়। তাদের খাবার এই পান্তা। গ্রামে বৈশাখ ঘিরে বসে নানারকম মেলা। এসব মেলায় জায়গা করে নেয় নানারকম খাবার এবং হাতে বানানো নানান গৃহস্থালির জিনিস। এসব মেলা কিন্তু এক-দুদিনের নয়। সপ্তাহ ও দশদিন এমনকি পনেরো দিনও চলতে থাকে। অনেক মেলায় আবার আসর জমে মঞ্চ নাটকের। কোথাও পালাগান। কোথাও যাত্রা। আবার কোথাও আধুনিক নাটকের স্থান হয়ে যায়।

বৈশাখ আমাদের এভাবে জাগিয়ে দেয়। এভাবে আপ্লুত করে। আমরা আমাদের করে পেয়ে যাই আমাদের বৈশাখ। আমাদের নববর্ষের আনন্দ কাব্য।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

২রা এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

প্রয়োজন অটিজম সচেতনতা

আবু সালেহ মোহাম্মদ মুসা

পরিবারে যখন একটি শিশুর জন্ম হয়, তখন তাকে ঘিরে হাজারো কল্পনা বা স্বপ্নের জাল বুনেন তার মা-বাবাসহ পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা। শিশুটিকে সুষ্ঠুভাবে লালনপালন করে মানুষ করার ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ে পরিবারটির ওপর। মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই অতি আনন্দের সাথে এ দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে থাকা শিশুটির বিকাশের পথে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, আর তা যদি হয় অটিজম তাহলে সেই পরিবারটির যে কী বিড়ম্বনা আর কষ্ট হতে পারে- তা কেবল ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো অনুভব করার শক্তি নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা এপ্রিল ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১১তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

কিন্তু কখনো কখনো মা-বাবার পাশাপাশি অন্যরাও ঘরের ছোটো শিশুটিকে নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। আর এটি চোখে পড়ে যখন শিশুটির বয়স দেড় থেকে তিন বছর। শিশুটির আচরণে কেমন যেন ব্যতিক্রম এবং আশপাশের বাচ্চাদের সাথে কিছুটা অমিল লক্ষ করা যায়। শিশুটির মধ্যে সর্বদা অস্থিরতা, জড়তা ও মনোযোগের অভাব দেখা যায়। এসব দেখে আদরের সোনামণির জন্য পিতামাতার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস হচ্ছে, মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশের একটি জটিল প্রতিবন্ধকতা। বিশ্বে প্রায় প্রতি ১১০ জনে ১ জন শিশু এ সমস্যায় ভুগছে। বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে অটিজমের হার প্রায় ০.৮ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি হাজারে প্রায় ৮ জন। সাধারণত এদের শারীরিক গঠনে কোনো ত্রুটি বা সমস্যা থাকে না। তাদের চেহারা ও অবয়ব অনেকটা অন্যান্য সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর মতোই। শিশুর প্রতিবন্ধকতা জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রকাশ পায়। অটিজমে আক্রান্ড় শিশু তার পরিবেশের সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারে না। নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। আচরণগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। একই কাজ বা আচরণ বার বার করতে থাকে। সঠিকভাবে ভাষার ব্যবহার করতে পারে না, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না, নিজের মতো করে থাকতে পছন্দ করে। অটিজমের কিছু কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে যা প্রায় সকল অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে দেখা যায় আবার প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা কিছু লক্ষণ থাকতে পারে। অটিজমে ছেলে বা মেয়ে যে-কোনো শিশুই আক্রান্ড় হতে পারে। তবে মেয়ে শিশুদের তুলনায় ছেলে শিশুদের আক্রান্ড় হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় চার গুণ বেশি।

অটিজমের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে–

- ভাষার বিকাশের সমস্যা
- সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমস্যা
- সাধারণ শিশুদের মতো এরা খেলাধুলা করে না।

তবে 'ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকাল ম্যানুয়াল অব মেন্টাল ডিসঅর্ডাস (চতুর্থ সংস্করণ)'– এ অটিজমকে মোট পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

- ক্লাসিক্যাল অটিজম
- এসপারজার সিনড্রোম
- পারভেসিভ ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড

- রেট সিনড্রোম
- সিডিডি শৈশবকালীন সমন্বয়হীনতার বিকৃতি।

সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'তথ্য আপা প্রকল্প'-এর তথ্য অনুযায়ী অটিজম সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া যায়–

অটিজমের বিভিন্ন বয়সে চিহ্ন

৩ মাস বয়সে

- উচ্চ শব্দে কোনো প্রতিক্রিয়া করে না
- চলমান বস্তুর প্রতি মনোযোগী হয় না
- কাউকে দেখে হাসে না
- বু বু শব্দ বা babble করে না
- নতুন মুখ দেখার ক্ষেত্রে মনোযোগী না
- মুখের কাছে তার হাত আনে না।

৭ মাস বয়সে

- কোনো জায়গা থেকে শব্দ আসলে সেই শব্দ কোথা থেকে আসছে তা জানার জন্য ঘাড় ঘুরায় না
- আপনার বা কাছের মানুষের প্রতি কোনো ভালোবাসা প্রকাশ করে না
- হাসে না
- লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না
- কর্মকাণ্ডের দ্বারা অন্যের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে না
- খেলাধুলায় অনাগ্রহী
- কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে না
- কোনো আওয়াজ করে না।

৯ মাস বয়সে

- আপনার নির্দেশিত পয়েন্টে দৃষ্টিপাত করে না
- নিজের নামে কোনো প্রকার সাড়া দেয় না
- কোনো বু বু, বাবা, মামা, টাটা–এ ধরনের আওয়াজ করে না
- পেছনের খেলা খেলে না
- পরিচিত মানুষদের চিনতে পারে বলে মনে হয় না
- সাহায্য নিয়ে বসে না
- পায়ের সাহায্যে ওজন বহন করতে পারে না
- এক হাত থেকে অন্য হাতে খেলনা পরিবর্তন করতে পারে না।

১২ মাস বয়সে

- হামাগুড়ি দেয় না
- একটা শব্দও বলে না
- কোনো অঙ্গভঙ্গি করে না। যেমন: মাথা দোলানো বা মাথা নাড়ানো, টাটা দেওয়া, হ্যাঁ বা না বোধক মাথা নাড়ানো ইত্যাদি
- কোন ছবি বা বস্তুর দিকে নির্দেশ করে না
- কোনো কিছু পাওয়ার জন্য হাত বা দৃষ্টি দিয়ে দেখিয়ে দেয় না বা কোনো কিছু আঁকড়ে ধরে না
- তাকে দেখিয়ে কোনো জিনিস লুকালে তা খোঁজে না
- কোনো কিছুর সাহায্যে দাঁড়ায় না।

১৮ মাস বয়সে

- গৃহস্থালি অনেক সাধারণ জিনিসের কাজ সম্পর্কে বোঝে না। যেমন: টেলিফোন, কাটাচামচ, চামচ
- অন্যের শব্দ বা কাজ অনুকরণ করে না
- সর্বোচ্চ ৬টি শব্দ বলতে পারে
- নতুন শব্দ শিখতে পারে না
- হাঁটতে পারে না
- পুরোনো দক্ষতা যা তার পূর্বে ছিল তা হারিয়ে যায়।

২৪ মাস বয়সে

- হাঁটে না, আর হাঁটলেও অটলভাবে না
- ১৫টি শব্দের বেশি বলতে পারে না
- দুই শব্দের বাক্য ব্যবহার করতে পারে না
- গৃহস্থালি অনেক সাধারণ জিনিসের কাজ সম্পর্কে বোঝে না। যেমন: টেলিফোন, কাটাচামচ, চামচ
- নিজের বা অন্যের শব্দ বা কাজ অনুকরণ করে না
- আপনার সাধারণ নির্দেশনাবলি মান্য করতে পারে না।

৩ বছর বয়সে

- কথা থাকে অস্পষ্ট
- একটি বাক্যে কথা বলতে পারে না
- সাধারণ নির্দেশাবলি মানতে পারে না
- সাধারণ খেলনা দিয়ে খেলতে পারে না। যেমন: সাধারণ ধাঁধা, নব বাকান খেলা ইত্যাদি
- খেলনার প্রতি আকর্ষণ কম থাকে
- অন্য শিশুদের সাথে খেলতে চায় না
- চোখে চোখ রাখে না
- সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামায় সমস্যা হয়
- তার নিজস্ব এক সময়ের স্মৃতি ভুলে যায়।

৪ বছর বয়সে

- অন্য শিশুদের এড়িয়ে চলে
- পরিবারের বাইরে অন্য কাউকে গ্রাহ্য করে না
- খেলায় কোনো আগ্রহ থাকে না
- পছন্দের গল্প পুনরায় বলতে পারে না
- তুমি, আমি– এ ধরনের সর্বনামের ভুল প্রয়োগ করে
- আলাদা আর একই এর পার্থক্য বোঝে না
- অস্পষ্টভাবে কথা বলে
- রং দিয়ে হিজিবিজি আঁকে না
- তার নিজস্ব এক সময়ের স্মৃতি ভুলে যায়।

৫ বছর বয়সে

- ব্যাপক আকারে তার আবেগ প্রকাশ করতে পারে না
- বিভিন্ন সময়ে চরম আকারে ক্ষিপ্র হয়ে যায় (যেমন: অযাচিত রাগ, অতিরিক্ত ভয়, অতিরিক্ত দুঃখিত হওয়া, লজ্জা পাওয়া)
- সামাজিক অবস্থায় নিজেকে খাপ খাওয়ায় না
- কোনো কর্মকাণ্ডে পাঁচ মিনিটের বেশি মনোযোগী হয় না
- কৃত্রিম সাড়া দেয় না
- বিশ্বাস ও বাস্তবতার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না
- বিস্তৃত কোনো কাজ বা খেলায় অংশ নেয় না
- নিজের নামের প্রথম ও শেষ অংশ বলতে পারে না
- সংখ্যা, সর্বনাম, অতীতকালের ব্যবহার ঠিকভাবে করতে পারে না
- দিনের কার্যাবলি বলতে পারে না
- ছবি আঁকতে পারে না
- সাহায্য ছাড়া দৈনন্দিন কাজ করতে পারে না। যেমন: দাঁত ব্রাশ, হাত ধোয়া, নিজের জামা পড়া ইত্যাদি
- তার নিজস্ব এক সময়ের স্মৃতি ভুলে যায়।

বয়ঃসন্ধি ও পরিণত বয়সের অটিস্টিক

- সামাজিক দক্ষতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা থাকে
- চোখে চোখ রাখার বিষয়টি এড়িয়ে চলে
- দিনের কাজ করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছা দেখায়
- পুনরাবৃত্তি করে

- আলো, শব্দ বা স্পর্শের প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল থাকে কিন্তু ব্যথা পেলেও সে ব্যাপারে উদাসীন থাকে
- তার নিজস্ব একসময়ের স্মৃতি ভুলে যায়।

আচরণগত লক্ষণ

বিভিন্ন শিশুর জন্য অটিজমের লক্ষণ বিভিন্ন হলেও মোটামুটি সাধারণ কিছু উপসর্গ প্রায় সব অটিস্টিক শিশুর মাঝেই দেখা যায়। তাদের এই সমস্যাগুলোকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- সামাজিক না হবার প্রবণতা
- ভাষার সমস্যা
- আচরণের সমস্যা।

সামাজিক না হবার প্রবণতা

- তাকে নাম ধরে ডাকলে সে জবাব দেয় না
- চোখের দিকে কম তাকায় বা তাকায় না
- এমন ভান করে যে মনে হয় তাকে উদ্দেশ করে বলা কথা সে শুনতে পাচ্ছে না
- অন্য কেউ হাত ধরতে গেলে বা জড়িয়ে ধরতে গেলে বাধা দেয়, নিজেকে ছুঁতে দেয় না
- নিজের জগতের বাসিন্দা হয়ে থাকার প্রবণতা থাকে, সব সময় একলাই খেলে
- কোন কিছুর জন্য সাহায্য চায় না বা অনুরোধ করে না।

নির্দিষ্ট কোনো কারণে অটিজম হয় এমনটি বলা যাবে না। বংশগত ও পরিবেশগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার হওয়ার ক্ষেত্রে গর্ভকালীন জটিলতা, ভাইরাল ইনফেকশন এবং বায়ু দূষণকারী উপাদানসমূহ সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন জিনের কারণে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার হতে পারে। মস্তিষ্কের কিছু জিন কোষসমূহের পরিবহণ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টি করে এ রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। জেনেটিক সমস্যা কখনো বংশগতও হতে পারে আবার নির্দিষ্ট কোনো কারণ ব্যতীতও হতে পারে। কোনো কোনো শিশুর ক্ষেত্রে জেনেটিক ডিজঅর্ডার যেমন– রেট সিনড্রোম বা ফ্র্যাজাইল এক্স সিনড্রোমের সাথে এই রোগটি হতে পারে।

পরিবারে কারো অটিজম বা শারীরিক, মানসিক সমস্যা থাকলে পরিকল্পিত গর্ভধারণ খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে গর্ভধারণের আগে ও পরে অনেক ধরনের সতর্কতা অবলম্বন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অটিজম প্রতিরোধে বেশি বয়সে বাচ্চা না নেওয়া, বাচ্চা নেওয়ার আগে মাকে রুবেলা ভেকসিন দেওয়া, গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম, অধিক দুশ্চিন্তা না করা, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ সেবন না করা, মায়ের ধূমপান, মদ্যপানের মতো কোনো অভ্যাস থাকলে তা সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা, নিয়মিত উপযুক্ত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চেকআপ করা ইত্যাদি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। অটিজমসহ বেশকিছু রোগ প্রতিরোধে শিশুদের ১৫ বছর বয়সে হাম, রুবেলা টিকা নেওয়া জরুরি। সকল শিশুকে অবশ্যই মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, কখনো পড়ে গিয়ে বা কোনোভাবে আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

অটিজম নিয়ে জনসচেতনতার অভাবে অভিভাবকরা কী করবেন এটা সঠিকভাবে বুঝে উঠতে না পেরে অবহেলায় ও বিনা চিকিৎসায় শিশুকে বড়ো করেন, উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে অনেক অভিভাবক দিশেহারা হয়ে পড়েন। আর মা-বাবা যদি শিক্ষিত না হন তাহলে বিষয়টি নিজেদের অজান্তে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় রূপ নেয়। ২০০৬ সালে জাতিসংঘ 'বিশ্বে প্রতিবন্ধী মানুষেরও পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে'– এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ ঘোষণা করেছে। আমাদের সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় জাতিসংঘে গৃহীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সনদে স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। সে আলোকে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিবন্ধিতার ধরন ও মাত্রানুসারে তাদের সেবা দেওয়ার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় শারীরিক, দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১৯৬২ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমান সরকার স্নায়বিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সমাজের মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন ২০১৩ প্রণয়ন করার মাধ্যমে একটি যুগান্তকারী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

প্রতিবন্ধী ও অভিভাবকদের সাথে অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন

প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন স্নায়ু বিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক (অটিজম)–এর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলে অটিজম বিষয়ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় (WHO) চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে যোগাযোগ রেখে অটিজম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া দেশে বর্তমানে বেশকিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কাজ শুরু করেছে যদিও তা বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীর জন্য যথেষ্ট নয়। সরকারের এ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের এগিয়ে আসার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। জনগণের মধ্যে অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি একান্ত জরুরি। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের শিশুদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সর্বোপরি পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে দ্রুত। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগগুলো যাতে আরও দ্রুত জনগণের জন্য সহজলভ্য হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তবে সবার আগে প্রয়োজন সচেতনতা আর সহানুভূতি প্রদর্শন।

লেখক: প্রাবন্ধিক, ফটোফিচার: মো. ফরিদ হোসেন

প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

২১শে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ড় সারাদেশের ১৫,৪১,১৪৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ডাটাবেজে অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৯টি জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আলাদা করে বিস্ড়ারিত তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রণীত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চলমান আছে। বলা যায়, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি। এ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দৌহিত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য তনয়া সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের তৎপরতায়।

যে-কোনো দুর্যোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাই সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। তাদেরও কষ্ট আছে, অনুভূতি আছে, আছে বেঁচে থাকার ও সকল নাগরিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার। সভ্য সমাজে সুশাসন নিশ্চিত করতে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাই দুর্যোগ দুর্বিপাকে প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর জন্য চাই অগ্রাধিকার সেবা ও নিরাপত্তা। এ উপলব্ধি থেকে সরকার প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য করণীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণে ব্রতী হয়েছে।

প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রথমেই চাই জনসচেতনতা। প্রতিবন্ধী মানুষেরা এ সমাজেরই অংশ– সাধারণ মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। দুর্যোগকালে প্রতিবন্ধীদের সহায়তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের আচরণগত পরিবর্তন করতে হবে। একটা প্রতিবন্ধী মানুষকে হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। দেখবেন আপনার সামান্য মমতা, অনুকম্পা, একটু আদর-সোহাগ পাওয়ার জন্য তার চোখ, তার মন কেমন আকুলিবিকুলি করছে। একটু চিন্ড়া করে দেখুন, এ সমাজে প্রতিবন্ধী মানুষটি কত অসহায়! আশার কথা, সরকার প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের ও কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সটির পাইলটিং করা হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার পুল তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্সে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্ড়র্ভুক্তকরণে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। মনস্ড়ত্ত্ববিদ, গণমাধ্যম কর্মী ও প্রাথমিক সাড়াদানকারী দলের করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ড় কার্যক্রম চলমান আছে। পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' প্রণয়নপূর্বক সকল ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। দুর্যোগের কারণে শিশুদের ট্রমা ব্যবস্থাপনায় পরিবারের নারী সদস্যসহ অভিভাবক ও শিশুদের মনস্ড়াত্ত্বিক এবং মানসিকভাবে সক্ষম করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

দুর্যোগকালে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদেরকে মনো-সামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি National Trauma Counseling Centre (NTCC) এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর, খুলনা ও দিনাজপুরে ৯টি Regional Trauma Counseling Centre (RTCC) স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি মিয়ানমার থেকে আগত বলপূর্বক বাস্ড়চ্যুত নারী ও শিশুদের জন্য কক্সবাজারে একটি ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও ১০টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার সেবা দেওয়ার জন্য চাই আইনি কাঠামো। সরকার সে লক্ষ্যেও কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দলিল 'স্থায়ী আদেশাবলির' নতুন সংস্করণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করণীয় অন্ড়র্ভুক্ত করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আইনি কাঠামো ও নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে ভিটা উঁচুকরণ কার্যক্রমসহ সকল অবকাঠামোর নির্মাণ প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে করা হচ্ছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)-এ প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের প্রত্যেক বরাদ্দে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ ভাগ অর্থ রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে, ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করতে চাই সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় কমিটি থেকে ওয়ার্ড কমিটি পর্যন্ড় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন তারা নিজেদের কথা বলার প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফরম পেয়েছেন, নিজেদের মতামত রাখতে পারছেন।

প্রতিবন্ধিতাবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে যার প্রধান উপদেষ্টা সায়মা হোসেন। মূলত তাঁর উদ্যোগেই প্রতিবন্ধিতাকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল'-এর সভায় প্রতিবন্ধিতা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি আন্ড়র্জাতিক সম্মেলন ১২–১৪ই ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়, বাংলাদেশের নিজস্ব উদ্যোগে। ঢাকা সম্মেলনে ১৮টি দেশের প্রতিনিধি, ইউএনআইএসডিআর, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কর্মরত আঞ্চলিক এবং আন্ড়র্জাতিক বেসরকারি সংগঠন, পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দল ও সংগঠন, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সংস্থা এবং অন্যান্য উন্নয়ন খাতের প্রতিনিধিত্বকারীগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক-জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ করে এমন বাধাসমূহ শনাক্ত, হ্রাস এবং দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ, সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ, জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিভিত্তিক উপাত্ত বিন্যস্ড় করে ডাটাবেজ তৈরি, বিভিন্ন আপদের পূর্ব সতর্কীকরণ প্রক্রিয়ায় গণমুখী ব্যবহার উন্নয়নসহ কতগুলো যুগান্ড়কারী সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করা হয়েছে। এ সম্মেলনকে পরে জাতিসংঘের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে করা প্রথম আন্ড়র্জাতিক সম্মেলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আগামী মে মাসে ঢাকাতেই দ্বিতীয় আন্ড়র্জাতিক সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। আমরা চাই প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী মূলধারায় সম্পৃক্ত হোক। তবেই সম্ভব হবে টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

লেখক: সিনিয়র তথ্য অফিসার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

গুলেনব্যারি সিনড্রোমে অকুপেশনাল থেরাপি

রাবেয়া ফেরদৌস

পৃথিবীর মানুষের নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বারোপ করে এর সমাধান ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল গঠিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিবসে অর্থাৎ প্রতিবছর ৭ই এপ্রিল সারাবিশ্বে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশেও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সারাদেশে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে দিবসটি পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো 'সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা : সবার জন্য, সর্বত্র'।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ৭ই এপ্রিল ২০১৭ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে এবার একটি অপ্রচলিত রোগ নিয়ে আলোকপাত করা হলো। রোগটি হলো জিবিএস বা গুলেনব্যারি সিনড্রোম। বাংলাদেশে গুলেনব্যারি সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক। দিন দিন রোগটির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এ রোগে আক্রান্ত হয়। সংক্ষেপে গুলেনব্যারি সিনড্রোমকে জিবিএস বলা হয়।

এটি একটি বিরল রোগ যেটি শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী স্নায়ুকোষগুলোর কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়। যার ফলে শরীরের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়ে।

জিবিএস প্রতি এক লক্ষে এক থেকে দুই জনের মধ্যে দেখা যায়। এর নামকরণ ফরাসি চিকিৎসক জর্জ গুলেন ও জিন আলেকজান্ডার ব্যারির নাম অনুসারে হয়েছে। যে-কোনো বয়সেই জিবিএস হতে পারে। তবে ৩০ থেকে ৩৫ বছর বয়সের মানুষ এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। নারীদের তুলনায় পুরুষদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

জিবিএস-এর কারণগুলো এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, ফুসফুস বা পেটে সংক্রমণের কারণে এ রোগটি হতে পারে। 'ক্যাম্পাইলো ব্যাকটর জেজুনি' জীবাণুতে আক্রান্ত ডায়রিয়া রোগী বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত সর্দি-জ্বরের রোগীরা পরবর্তী পর্যায়ে জিবিএস-এ আক্রান্ত হয়। কখনো কখনো ভ্যাকসিন দেওয়ার পরও এ রোগটি হতে পারে।

জিবিএস-এর প্রথম উপসর্গই শুরু হয় পা, পায়ের পাতা বা আঙুল ঝিনঝিনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এটি হাত ও হাতের আঙুলে বিস্তার লাভ করে। উপসর্গগুলো খুব দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে।

গুলেনব্যারি সিনড্রোমের প্রধান লক্ষণগুলো হলো

- হাত ও পায়ের আঙুলে ঝিনঝিন ভাব
- হাত ও পায়ের মাংসপেশি দুর্বল হয়ে পড়া
- চোখের পেশি দুর্বল হয়ে পড়া
- কথা বলতে ও গিলতে সমস্যা
- শরীরের বিভিন্ন জায়গা যেমন ঘাড়, পিঠ, কোমর ইত্যাদি জায়গায় ব্যথা থাকতে পারে।

মূলত জিবিএস রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম বা এমডিটি টিম কাজ করে থাকে। এই টিমে রয়েছেন: নিউরোলজিস্ট, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট,সোস্যাল ওয়ার্কার, নার্স এবং রোগীর পরিচর্যাকারী।

অকুপেশনাল থেরাপি চিকিৎসা

একজন জিবিএস রোগী যখন অকুপেশনাল থেরাপিস্টের কাছে আসেন তখন প্রথমেই থেরাপিস্ট রোগীকে অ্যাসেসমেন্ট করে থাকেন। এর মাধ্যমে রোগীর প্রকৃত সমস্যা শনাক্ত করা সম্ভব হয়। রোগীর সমস্যা অনুযায়ী অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা যে চিকিৎসা সেবা রোগীকে দিয়ে থাকেন সেগুলো হলো:

- বিভিন্ন অবস্থায় যেমন হাঁটা, দাঁড়ানো, বসা এবং শোয়ার সময় রোগীর দেহের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং দেখানো;
- রোগীকে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাতের শক্তি বাড়ানো;
- রোগীকে নিজের কাজগুলো নিজে নিজে করার ট্রেনিং দেওয়া;
- রোগীকে কলম ধরে সঠিকভাবে লেখানোর পদ্ধতি শেখানো;
- রোগীর হাতের অবস্থান ঠিক রাখার জন্য সহায়ক উপকরণ দেওয়া;
- হাঁটার সময় পায়ের সঠিক অবস্থান ধরে রাখার জন্য সহায়ক উপকরণ দেওয়া;
- রোগীকে সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে কাজগুলো করার নিয়ম সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া ইত্যাদি।

জিবিএস রোগী সঠিকভাবে চিকিৎসা পেলে দ্রুত সুস্থ হয়ে যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন রোগীকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো, ওষুধগুলো নিয়মিত খাওয়ানো এবং পাশাপাশি নিয়মিত থেরাপি দেওয়া। তাহলেই রোগী ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে অগ্রসর হবে।

বাংলদেশে অকুপেশনাল থেরাপি সম্পর্কে মানুষ এখনো সচেতন নয়। দেশের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট থাকলে জনগণ উপকৃত হবে এবং তাদেরকে থেরাপির জন্য বিদেশে যেতে হবে না।

লেখক: চিকিৎসক, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল

৩রা এপ্রিল: জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস

লতা খান

চলচ্চিত্র হচ্ছে বিনোদনের মাধ্যম, দেশের সম্পদ এবং একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর মাধ্যমে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটিয়ে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ছিল দেশের চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। তিনি ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত বিলটি পাসের মাধ্যমে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তখন থেকে দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আধুনিক স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরি সুবিধাসহ একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ফলেই আজকের 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' (বিএফডিসি) আমরা পেয়েছি। তাঁর সময়ে বিএফডিসি চলচ্চিত্র উৎপাদনে নির্মাতাদের কাঁচামাল ও কারিগরি সহায়তা প্রদান শুরু করে। ফলে গণমাধ্যম ও সংস্কৃতির মাধ্যম হিসেবে বিকশিত হতে থাকে বাংলা চলচ্চিত্র। নির্মিত হয় প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। বাংলা চলচ্চিত্র পেয়েছে জহির রায়হান, সুভাষ দত্ত ও খান আতাসহ অনেক গুণী চলচ্চিত্রকার এবং আব্দুল জব্বার খান, রাজ্জাক, ফারুক, সৈয়দ হাসান ইমাম, কবরী, ববিতা, শাবানার মতো বহু মেধাবী শিল্পীদের।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে উৎকর্ষতার যুগ শুরু হয়। এসময়ে মুক্তিযুদ্ধ ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। এছাড়া চলচ্চিত্র নিয়ে আন্তর্জাতিক উৎসব ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা চলচ্চিত্রের অংশগ্রহণ শুরু হয়। বিদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলে চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালকদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র উৎসব, মেলা, প্রদর্শনী, সভা-সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষার জন্য বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করা হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রবর্তিত সেন্সর আইন ও বিধি সংশোধন করা হয়। অসুস্থ শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের জন্য 'প্রধানমন্ত্রীর সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ তহবিল' গঠন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চলচ্চিত্রের উন্নয়নের জন্য পৃথক অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

বর্তমান সরকারও চলচ্চিত্রের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং চলচ্চিত্রকে 'শিল্প' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ঢাকার অদূরে কবিরপুরে ফিল্ম সিটি এবং বিএফডিসিতে বহুতল ডিজিটাল ফিল্ম কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সাল থেকে ৩রা এপ্রিলকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন থেকে ঐ দিনটি জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে দেশব্যাপী পালিত হয়ে আসছে।

এবারের জাতীয় চলচ্চিত্র দিবসের মূল প্রতিপাদ্য– 'ঐতিহ্যের ভিত্তি ধরি, দেশের ছবি রক্ষা করি'। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিএফডিসি চত্বরে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ও বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর যৌথ উদ্যোগে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ২০১৮' অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একেএম রহমতউল্লাহ এমপি এবং তথ্যসচিব আবদুল মালেক। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বিএফডিসি'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আমির হোসেন ও বিশিষ্ট অভিনেতা এ টি এম শামসুজ্জামান।

র‍্যালি, চলচ্চিত্র মেলা, টক শো, রেড কার্পেট সংবর্ধনা, স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা এবং উত্তরণের উপায়' শীর্ষক সেমিনার এবং জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় দিবসটি। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করেন। দিবসটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শিল্পী, কলাকুশলীসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, দপ্তর প্রধানগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ৩রা এপ্রিল ২০১৮ বিএফডিসি চত্বরে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস-২০১৮' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একেএম রহমতউল্লাহ এমপি এবং তথ্যসচিব আবদুল মালেক সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন–পিআইডি

লেখক: প্রাবন্ধিক

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

মো. শাহেদুল ইসলাম

বর্তমানে পড়ালেখা কেবল শ্রেণিকক্ষ বা পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নয়, পড়ালেখার অঙ্গনে লেগেছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়া। প্রচলিত শ্রেণিকক্ষের জায়গা দখল করেছে ডিজিটাল ক্লাসরুম, পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তিত হয়েছে ডিজিটাল বই বা পিডিএফ ফাইল এবং ডিজিটাল-মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন। তাইতো কুমিল্লা জেলার সংরাইশ সালেহা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সালমা আক্তার স্কুলে প্রচারিত মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের অভিমত ব্যক্ত করছিলেন এইভাবে– পর পর বিজ্ঞানের দুটি ক্লাসে মনে হচ্ছিল এ যেন পুরো বিশ্বটাকে দেখছি। প্রথম ক্লাসটিতে দেখানো হচ্ছিল মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কেমন করে দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। অপর ক্লাসটিতে দেখানো হলো পৃথিবী কী? সংরাইশ সালেহা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মতিন মোল্লা বলেন, ডিজিটাল পাঠদান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা শোনার পর মনের কল্পনায় শেখার গতানুগতিক পদ্ধতি ব্যতীত বাস্তবে অবলোকন করে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণায় অতি সহজে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে। শিক্ষার্থীরা শোনার চেয়ে অবলোকন করার কারণে তাদের শিক্ষাফল স্থায়ী হচ্ছে। তাছাড়া মুখস্থ ও গদবাঁধা নিয়মের বাইরে ছবি দেখে শিক্ষাপাঠের আনন্দ লুফে নিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। এখন ক্লাসে ক্লাসে উপস্থিতির সংখ্যাও বেড়ে গেছে।

২০১২ সালের ২০শে মে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলার রিয়াজউদ্দিন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের উদ্‌বোধন করেন। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের গণিত শিক্ষক মো. বোরহান উদ্দিন বিনোদ কুমার ও কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ রীমা বেগম জানান, বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৮০০ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ১টি প্রজেক্টর ও ল্যাপটপ ছাড়াও আরো ১৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস করার জন্য পৃথক রুম ও ল্যাব। প্রতি সপ্তাহে ৪-৫টি ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

২০১১ সালে জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে একসেস টু ইনফরমেশন অব বাংলাদেশ (এটুআই) প্রকল্পের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিপ্তরের আওতায় ইনফরমেশন কমিউনিকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি (আইসিটি) প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রায় ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু হয়। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় চলতি শিক্ষাবর্ষে ১৫ হাজার স্কুল-কলেজে মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতিতে শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করতে এবং শিক্ষার্থীদের মুখস্থ বিদ্যায় বাইরে নিয়ে আসতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি প্রকল্প পরিচালক বলেন, জাতিকে আধুনিক চিন্তা চেতনার সাথে সম্পৃক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ ও নির্দেশনায় শিক্ষাকে আকর্ষণীয় এবং বিনোদনমূলক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে সহজে উপস্থাপনের জন্য এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৫ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালুর জন্য ল্যাপটপ, মডেম, সাউন্ড বক্স ও স্পিকারসহ প্রজেক্টর দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সহকারী অধ্যাপক ইসলাম উদ্দিন বলেন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসে পাঠদানের জন্য আইসিটি আই-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দেশের ১৯টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সবশ্রেণির সব ক্লাসেই মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমে পাঠদানে সক্ষম হবে। ইতোমধ্যে সরকারের উদ্যোগে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই ডিজিটালাইজেশন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনের স্বপ্নযাত্রার পথ প্রস্তুত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম-এর জাতীয় প্রকল্প পরিচালক বলেন, বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে এবং ক্লাসরুমকে টিচার্স সেন্টার না বানিয়ে স্টুডেন্টস সেন্টার বানানোর জন্য এ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বর্তমানে ক্লাসে শিক্ষকরা বইয়ের মাধ্যমে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের পাঠ দিচ্ছেন। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বিষয়ই বোধগম্য হয়ে উঠছে না। ফলে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা বিষয়টি না বুঝেই বা বিষয়ের গভীরে না গিয়ে মুখস্থ করছেন। এ থেকে মুক্তি দিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিষয়টির কার্যপ্রণালি, গতিবিধিসহ সব কিছু ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এজন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যেমন– খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করছে, মানুষের জিনচক্র কীভাবে আবর্তিত হচ্ছে, সমাজের গতি প্রকৃতি কীভাবে সামনে এগুচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সহজে বোঝা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে ক্লাস হয়ে উঠবে আকর্ষণীয় বিনোদন কেন্দ্র। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হারও কমে আসবে।

ডিজিটাল শিক্ষাক্ষেত্র প্রসঙ্গে কুমিল্লা জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুর রশিদ সরকার বলেন, ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। অর্থাৎ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে একাধিক স্লাইডের সাহায্যে যে-কোনো মূর্ত-বিমূর্ত বিষয় অতি সহজেই শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দময় ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। সনাতন চক, ডাস্টার, চকবোর্ড দিয়ে শিক্ষার্থীদের অনেক তত্ত্বগত ধারণা যথাযথভাবে দেওয়া অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কিন্তু ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে একাধিক স্থির বা চলমান চিত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যে-কোনো বিষয় পূর্ণ ধারণা দেওয়া সম্ভব।

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি– এই মূলমন্ত্র ধারণ করে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির দুটি মডেল উদ্ভাবনের ফলে শিক্ষকেরা তাঁদের তৈরি এসব কনটেন্ট একটি লেখালাপে (ব্লগে) আপলোড করছেন। এতে সবাই মিলে মানসম্মত কনটেন্ট তৈরি করতে পারছেন। একসঙ্গে না বসেও একত্রে কাজ করছেন, যৌথভাবে কাজ করার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হচ্ছেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যপুস্তক এখন ই-বুক। শিক্ষকদের তৈরি মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ই-বুকে অন্তর্ভুক্ত করায় ভালো শিক্ষকের ভার্চুয়াল ক্লাসে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও যোগ দিতে পারছে। বর্ণ, শব্দ এবং ছবি– এ তিনের সমন্বয়ে যে মাধ্যম তাকেই মাল্টিমিডিয়া বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। আর কল্পিত কাহিনির শৈল্পিক প্রকাশই হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া বা অ্যানিমেশন। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা অ্যানিমেশন নির্মাণকে সহজ করেছে। পাশাপাশি নান্দনিকতা এবং বৈচিত্র্য এনেছে। এই মাল্টিমিডিয়া ও অ্যানিমেশন প্রযুক্তি বিপুল বিশাল। ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে হচ্ছে সূর্যের মতো। সূর্যের আলো যেমন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে ব্যবহার করতে পারে তেমনি ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযুক্ত হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের মূল স্রোতে শামিল হতে পারে। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে ডিজিটাল কনটেন্ট সেতুবন্ধ তৈরি করবে। বাংলাদেশেও ডিজিটাল শিক্ষা বাস্তবায়নে একজন দিনমজুরের সন্তানও উচ্চশিক্ষা অর্জনে সক্ষম হবে।

লেখক: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

চলে গেলেন স্টিফেন হকিং

শারমিন সুলতানা শান্তা

গত কয়েক দশকে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ হিসেবে বিশ্বের সর্বত্র যাঁর পরিচিতি, তিনি হলেন স্টিফেন উইলিয়াম হকিং। তিনি শুধু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞই ছিলেন না, মহাকাশ বিজ্ঞানী, লেখক, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক মহাকাশবিদ্যা বিভাগের পরিচালক এবং শিক্ষাবিদও ছিলেন। স্টিফেন হকিং বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর সেরা বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। হকিংয়ের বাবা ডা. ফ্রাঙ্ক হকিং একজন জীববিজ্ঞান গবেষক ও মা ইসোবেল হকিং ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী।

লন্ডনের হাইগেটের বাইরন হাউজ স্কুলে স্টিফেন উইলিয়াম হকিং তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু করেন। ১৯৫০ সালে হকিংদের পরিবার হার্টফোর্ডশায়ারের সেন্ট অ্যালবানসে চলে যান। ১৯৫০-১৯৫২ সাল পর্যন্ত কয়েক মাস সেন্ট অ্যালবানসের মেয়েদের স্কুলে পড়েন হকিং। সে সময় ১০ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেরা মেয়েদের স্কুলে পড়তে পারত। পরে সেখান থেকে ছেলেদের স্কুলে চলে যান হকিং। ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে হার্টফোর্ডশায়ারের সেন্ট অ্যালবানসের 'সেন্ট অ্যালবানস স্কুলে' পড়াশুনা করেন তিনি। এ সময় তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে বোর্ড গেম খেলতেন, আতশবাজি প্রস্তুত করতেন, উড়োজাহাজ ও নৌকার মডেল তৈরি করতেন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে স্কুলের গণিত শিক্ষক ডিকরান তাহতার সাহায্যে তাঁরা ঘড়ির অংশবিশেষ, পুরোনো টেলিফোনের সুইচবোর্ড ও অন্যান্য রিসাইকেল করার উপাদান দিয়ে কম্পিউটার তৈরি করেন। বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হকিং স্কুলে 'আইনস্টাইন' নামে পরিচিত লাভ করেন। হকিংয়ের বাবা চেয়েছিলেন তিনি যেন তাঁর মতো ডাক্তার হন। কারণ, সে সময় গণিতে স্নাতকদের জন্য খুব বেশি চাকরির সুযোগ ছিল না। তাঁর পিতা নিজের কলেজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ভর্তি করাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে গণিতের কোর্স না থাকায় হকিং পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে ১৭ বছর বয়সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকে পড়াশুনা শুরু করেন হকিং। 'আইনস্টাইন' ডাকনামটার সার্থকতার প্রমাণ তিনি রেখে যাচ্ছিলেন অক্সফোর্ডেও। পড়াশুনা খুবই সহজ ছিল তাঁর কাছে। পদার্থবিজ্ঞানের একাডেমি কোনো সমস্যা দিলেই সমাধান হাজির–এমন মন্তব্য ছিল তাঁর তৎকালীন প্রফেসর রবার্ট বারম্যানের। তাই ধীরে ধীরে এ বিষয়ে তাঁর ধ্যান কমতে থাকে। ফার্স্ট ক্লাস নিয়ে অক্সফোর্ডের পড়াশুনা শেষ করে ক্যামব্রিজে পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করেন।

১৯৬৩ সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে মোটর নিউরন বা Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) রোগে আক্রান্ত হন স্টিফেন হকিং। এর ফলে তাঁর প্রায় সকল মাংসপেশি ধীরে ধীরে অবশ হয়ে যেতে থাকে। এ সময় মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েন হকিং। ডাক্তাররা তখন বলেছিলেন তিনি বড়োজোর ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচবেন। হকিংকে এ সময় ডাক্তাররা ব্যস্ত থাকা এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এরকম পরিস্থিতিতে তাঁকে সবচেয়ে সাহস জুগিয়েছিলেন জেন ওয়াইল্ড। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

ঠিকমতো কলমটাও ধরতে পারতেন না, এমন সময় হকিং আবার গবেষণায় ফিরে এলেন। ১৯৬৫ সালে থিসিস লেখা শুরু করলেন properties of Extending Universe (প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্যগুলো) নিয়ে। ১৯৬৬ সালে তা অনুমোদন পায়। থিসিস সুপাইভাইজার ডেনিস উইলিয়াম এ সময় তাঁর পাশে খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হুইলচেয়ার ছাড়া চলাচলের অন্য কোনো উপায় ছিল না হকিংয়ের। বিখ্যাত গবেষক রজার পেনরোজ স্বয়ং হকিংয়ের থিসিস কমিটিতে ছিলেন।

পিএইচডি শেষ করে ক্যামব্রিজে পেনরোজের সাথে কাজ শুরু করেন হকিং। পেনরোজ এবং তিনি মিলে ১৯৭০ সালে প্রমাণ করে দেখালেন যে, আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড কোনো এক অনন্যতা থেকেই শুরু হয়েছে। একই বছরে তিনি 'কৃষ্ণগহ্বর' নিয়েও আরো ব্যাপক কাজ শুরু করলেন। ষাটের দশকে পেনরোজ এবং হকিং মিলে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে একটি নতুন মডেল তৈরি করেন। সত্তরের দশকে তাঁরা 'পেনরোজ-হকিং তত্ত্বের প্রথমটি প্রমাণ করতে সক্ষম হন। অন্য গবেষকদের সাথে মিলে কৃষ্ণগহ্বরের ক্রিয়াকৌশল নিয়ে চারটি নীতি ১৯৭০ সালে তিনি উত্থাপন করেন। ১৯৭৩ সালে জর্জ এলিসের সাথে যুগ্মলেখক হিসেবে তিনি প্রথম বই প্রকাশ করেন, নাম The Large Scale Structure of Space-Time.

১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং বলেন, 'কৃষ্ণগহ্বর থেকে বিকিরণ হয় এবং এটা ততদিন চলবে যতদিন এটার শক্তি শেষ না হয়, যতদিন এটা বিকিরণ করতে করতে উবে না যায়'? এই বিকিরণকেই এখন হকিং বিকিরণ বা Hawking Radiation বলা হয়। স্টিফেন হকিং মূলত হকিং বিকিরণ, পেনরোজ-হকিং তত্ত্ব, বেকেনস্টাইন হকিং সূত্র, হকিং শক্তি, গিবন্স-হকিং আনসাৎজ, গিবন্স-হকিং প্রভাব, গিবন্স-হকিং মহাশূন্য, গিবন্স-হকিং-ইয়র্ক বাউন্ডারি টার্ম, থর্ন-হকিং-প্রেস্কিল বাজি, কৃষ্ণগহ্বর, তত্ত্বীয় সৃষ্টিতত্ত্ব, কোয়ান্টাম মহাকর্ষ প্রভৃতি তত্ত্বের দ্বারা পৃথিবীব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।

স্টিফেন হকিং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সম্মানীয় ফেলো এবং পন্টিফিক্যাল একাডেমি অব সায়েন্সের আজীবন সদস্য ছিলেন। ২০০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার 'প্রেসিডেন্সিয়াল মডেল অব ফ্রিডম' খেতাবে ভূষিত হন। ২০০২ সালে বিবিসির 'সেরা ১০০ ব্রিটনস' জরিপে তিনি ২৫তম স্থান লাভ করেন। তাঁর নিজের তত্ত্ব ও বিশ্ব তত্ত্ব নিয়ে রচিত বই 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' (আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম) রেকর্ড ভঙ্গ করা ২৩৭ সপ্তাহ ব্রিটিশ সানডে টাইমসের সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের তালিকায় ছিল। ২০০৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় কসমোলজি কেন্দ্রে হকিংয়ের একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। ২০০৮ সালে হকিংয়ের আরেকটি মূর্তি উন্মোচন করা হয় দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অবস্থিত আফ্রিকান ইনস্টিটিউট অব ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্সের সামনে। এছাড়া বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী কর্মক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ অ্যাডামস পুরস্কার (১৯৬৬), এডিংটন পদক (১৯৭৫), ম্যাক্সওয়েল পদক ও পুরস্কার (১৯৭৬), গণিতিক পদার্থবিদ্যায় ড্যানি হাইনম্যান পুরস্কার (১৯৭৬), হিউ পদক (১৯৭৬), আলবার্ট আইনস্টাইন পদক (১৯৮৭), রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির স্বর্ণপদক (১৯৮৫), ডিরাক পুরস্কার (১৯৮৭), উলফ পুরস্কার (১৯৮৮), প্রিন্স অব অ্যাস্টুরিয়াস পুরস্কার (১৯৮৯), অ্যান্ড্রু গেম্যান্ট পুরস্কার (১৯৯৮), নেলর পুরস্কার ও লেকচারশিপ (১৯৯৯), লিলিয়েনফেল্ড পুরস্কার (১৯৯৯), রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের আলবার্ট পদক (১৯৯৯), কপলি পদক (২০০৬), ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স পুরস্কার (২০১২) লাভ করেন।

স্টিফেন হকিংকে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে বেশকিছু চলচ্চিত্র ও ধারাবাহিক। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম (১৯৯২), স্টিফেন হকিংস ইউনিভার্স (১৯৯৭), হকিং ২০০৪ সালের টেলিভিশন চলচ্চিত্র হরাইজন: দ্য হকিং প্যারাডক্স (২০০৫), মাস্টার্স অব সায়েন্স ফিকশন (২০০৭), স্টিফেন হকিং অ্যান্ড দ্য থিওরি অব এভরিথিং (২০০৭), স্টিফেন হকিং: মাস্টার অব দ্য ইউনিভার্স (২০০৮), ইনটু দ্য ইউনিভার্স উইথ স্টিফেন হকিং (২০১০), ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড উইথ স্টিফেন হকিং (২০১১), স্টিফেন হকিংস গ্র্যান্ড ডিজাইন (২০১২), দ্য বিগ ব্যাং থিওরি (২০১২, ২০১৪, ২০১৭), স্টিফেন হকিং: আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম (২০১৩), দ্য থিওরি অব এভরিথিং (২০১৪), জিনিয়াস বাই স্টিফেন হকিং (২০১৬) ইত্যাদি।

হুইল চেয়ারে বসা এবং কৃত্রিম কণ্ঠে কথা বলা শারীরিক প্রতিবন্ধী স্টিফেন উইলিয়াম হকিংয়ের চিন্তার জগৎ ছিল অবারিত। মোটর নিউরন রোগ নিয়ে জনসচেতনতা গড়ে তুলেছিলেন তিনি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে সমাজের প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিয়েছিলেন তিনি। নিউইয়র্ক টাইমসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তাদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, তুমি এমন কাজের প্রতি দৃষ্টি দাও যেখানে ভালো করতে হলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। মানসিক দিক থেকে তুমি কখনো প্রতিবন্ধী হবে না। বিখ্যাত এ বিজ্ঞানী ১৪ই মার্চ ২০১৮ পরলোক গমন করেন। ৩১শে মার্চ ২০১৮ শনিবার লন্ডনে প্রয়াত বিজ্ঞানীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নেপালে বিমান দুর্ঘটনা: আমরা শোকাহত

জান্নাতে রোজী

১২ই মার্চ ২০১৮ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বাংলাদেশের ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের একটি বিমান বিধ্বস্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৫২ জন নিহত হয়েছে। ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দুপুর ১২টা ৫১ মিনিটে রওনা হয়ে বিএস ২১১ ফ্লাইটটি ২টা ২০ মিনিটে ত্রিভুবন বিমানবন্দরে ল্যান্ড করার কথা ছিল। আকাশে প্রায় আধঘণ্টা চক্কর দেওয়ার পর বিমানবন্দরের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে অনুমতি পেয়ে ত্রিভুবন বিমানবন্দরে অবতরণের সময় দুপুর ২টা ১৮ মিনিটে রানওয়ের পার্শ্ববর্তী ঘাসযুক্ত এলাকায় বিমানটি একদিকে হেলে পড়ে। নিমিষেই বিমানটিতে আগুন ধরে যায় এবং দুই টুকরো হয়ে যায়। আকস্মিক এ দুর্ঘটনার সময় বিমানটিতে ৬৭ জন যাত্রী এবং পাইলট, কো-পাইলট ও ২ জন ক্রুসহ মোট ৭১ জন ছিলেন। উল্লেখ্য, নেপালের ত্রিভুবন বিমানবন্দরটি পৃথিবীর অন্যতম দুর্ঘটনাপ্রবণ বিমানবন্দর এবং পর্বতঘেরা এ বিমানবন্দরে উড়োজাহাজ ওঠানামা সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ।

প্রাণসংহারী এ দুর্ঘটনায় কো-পাইলট পৃথুলা রশীদসহ ৪৭ জন যাত্রী আগুনে পুড়ে মারা যান। বিমানের পাইলট আবিদ সুলতানসহ আরো ৪ জন পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। সব মিলিয়ে নেপালের এ বিমান দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে পড়ে ৫২টি তাজা প্রাণ। নিহতদের মধ্যে ২৭ জন বাংলাদেশি, ২৪ জন নেপালি, এবং একজন চীনা নাগরিক ছিলেন। আহত ১৯ যাত্রীর মধ্যে বাংলাদেশি ৯ জন, নেপালি ৯ জন এবং মালদ্বীপের একজন। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন; তন্মধ্যে তিনজনের অবস্থা এখনো শংকটাপন্ন। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ৩৭ জন পুরুষ, ২৭ জন নারী ও ২টি শিশু। ইউএস বাংলার এ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ২টি শিশু, কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা ও একজন সাংবাদিক রয়েছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় মারা যান পাইলট আবিদ সুলতানের স্ত্রী এবং একজন প্রবাসী অভিভাবক।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রীবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সিঙ্গাপুর সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি ফোনে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির সঙ্গে কথা বলেন এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করেন। বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী যাত্রীদের স্বজনদের সাথে কাঠমাণ্ডু যান এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও নিহতদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করেন। নেপালে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এতে সার্বক্ষণিক ভূমিকা রাখেন।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহত দেশি-বিদেশি ৫২ জন আরোহীর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশে ১৫ই মার্চ জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। এদিন দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। দেশের সর্বস্তরের মানুষ কালো ব্যাজ ধারণ করে শোক দিবস পালন করে। ১৬ই মার্চ, শুক্রবার নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মাগফেরাত ও আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সকল মসজিদে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি মন্দির, গির্জা, প্যাগোডাসহ অন্যান্য উপাসনালয়েও বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় শহিদমিনারে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ক্রেন্দ্রের (টিএসসি) রাজু ভাস্কর্যে পৃথকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ নিহতদের স্মরণে মোমবাতি জ্বেলে শোক প্রকাশ করে।

দুর্ঘটনা কবলিত উড়োজাহাজটি বাংলাদেশের বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের মালিকানাধীন। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি ২০১৪ সালের ১৭ই জুলাই প্রথম দুটি উড়োজাহাজ দিয়ে অভ্যন্তরীণ রুটে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে। বর্তমানে সাতটি রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে এই এয়ারলাইন্স।

বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান পরিবহণ শিল্পে এ নিয়ে মোট ৭টি বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে। প্রায় ৩৪ বছর আগে ১৯৮৪ সালের ৪ঠা আগস্ট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী ফকার বিমান এফ-২৭ চট্টগ্রাম থেকে এসে ঢাকার কুর্মিটোলায় (শাহজালাল) বিমানবন্দরে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অবতরণের সময় রানওয়ে ভেবে এয়ারপোর্টের পার্শ্ববর্তী একটি খালে অবতরণ করে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এ দুর্ঘটনায় বৈমানিক ক্যাপ্টেন কায়েস, সহ-বৈমানিক ও বাংলাদেশের প্রথম নারী বৈমানিক রোখসানা এবং যাত্রী, ক্রুসহ ৪৫ জন নিহত হন। দুর্ঘটনা কবলিত বিমানটির উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন তৎকালীন নৌবাহিনী প্রধান। ১৯৯১ সালের ১৫ই জুন বাংলাদেশ বিমানের একটি এফ-১৮ উড়োজাহাজ রাজশাহী বিমানবন্দরে অবতরণের সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে, তবে কেউ হতাহত হয়নি। ১৯৯৩ সালে একটি ডিসি-১০ বিমান ঢাকায় দুর্ঘটনায় পড়ে। ১৯৯৮ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর এয়ার পারাবতের একটি প্রশিক্ষণ বিমানে উড্ডয়নের সময় আগুন ধরে ঢাকার পোস্তগোলায় বিধ্বস্ত হয়। তাতে নিহত হন বৈমানিক ফারিয়া হোসেন লারা ও সৈয়দ রফিকুল ইসলাম। লারা কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের কন্যা। ২০০২ সালের ৭ই জুন পারাবতের আরেকটি প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে নিহত হন পাইলট মুখলেছুর রহমান সাকিব। এছাড়া ২০১৫ সালের ১লা এপ্রিল রাজশাহীর শাহ মখদুম বিমানবন্দরে বাংলাদেশ ফ্লাইং একাডেমির প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে বাংলাদেশের প্রথম সামরিক নারী শিক্ষানবিশ পাইলট তামান্না রহমান নিহত হন।

নেপালের রাজধানীতে এমন আকস্মিক বিমান দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ গভীর শোকাহত। নেপালেও চলছে শোকের মাতম। তবে শোকের মধ্যেও বাংলাদেশের জন্য সুখবর হলো ইউএস-বাংলার দুর্ঘটনা কবলিত বিমানটিতে আগুন ধরে যাওয়ার পর বিমানটির কো-পাইলট পৃথুলা রশীদ নিজের জীবন বাজি রেখে ১০ জন নেপালি যাত্রীকে বিমান থেকে বেরুতে সাহায্য করে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এ ঘটনা নেপাল ও বিশ্ব মিডিয়ায় ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। ভালোবেসে নেপালিরা বাংলাদেশের এ বীর নারীকে 'ডটার অব বাংলাদেশ' উপাধিতে ভূষিত করেছে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

আবার এসেছে বৈশাখ

আমিরুল হক

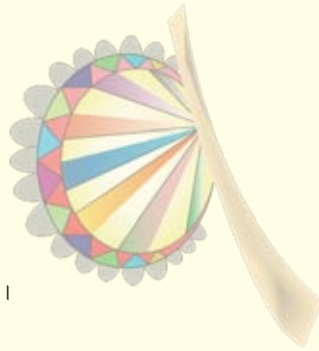

আবার এসেছে বৈশাখ
চৈত্রের খরতাপের উষ্ণ হৃদয়ের
সবুজ আঙিনায়।
নব চেতনায় উদ্ভাসিত বৈশাখ
আনে প্রাণ-প্রকৃতির মাঝে
নতুন সূচনার আমেজ।
ঋতু বৈচিত্র্যের নান্দনিক মিলনমেলায়
খেয়ালিপনায় মেতে ওঠে আপন মহিমায় বৈশাখ।
অশুভ জঞ্জাল জরা জীর্ণতাকে
মুছে ফেলে নতুনের আহ্বানে
এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখায়
অন্তহীন প্রেরণার উৎস হয়ে।
উজ্জীবিত হওয়ার ডাক নিয়ে আসে বৈশাখ
নতুন সম্ভাবনার দ্বার হয় উন্মোচিত।
বাঙালি সংস্কৃতির গর্বিত ঐতিহ্যের বর্ণিল আনন্দোৎসবমুখর
উচ্ছ্বাসের জোয়ার জাগায়
আনে নতুন প্রাণের ছন্দ।
ফসলের মাঠ-নদী-পথঘাটে
গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে
বৈশাখের রূপ মাধুর্যে ওঠে ভরে।
সর্বজনীন উৎসবের আয়োজনে
বর্ষবরণের দিন পহেলা বৈশাখ
তোমায় স্বাগত। শুভ নববর্ষ।

তৃণমূলবাসী

মনসুর জোয়ারদার

সন্ধ্যা ঘনালেই পিদিম আলোয়
পড়বে মনে অতীত গাথা
ছানাবড়া চোখে হুতুম পেঁচাও
গা ছমছমী বলবে কথা!
দেওয়াল ফুঁড়েই হিমেল বাতাস
বসবে জেঁকে মাটির ঘরে
তালগাছের ঐ ভূত-প্রেতরাও
ডাকবে নাকি বেতাল স্বরে!
বর্ষার নাচন, শীতের আমেজ
রসিয়ে লিখে যতই বলো
নব-প্রজন্মের ষড় ঋতুরাজ
আগের মতো আসে কি ভালো?
পাহাড় নিবাসী জটিবুড়ি নেমে
জমিনে হেঁটে বাড়াবে শীত
ঠক-ঠকাঠক্ কাঁপায় মানুষ
কাঁপিয়ে তোলে বাঁশের ভিত!
মজার হলেও রস পিঠা খেতে
লাগবে কিছু নবান্ন চাল
নিত্য অভাবীর এটুকু সাধেও
কে আর আছে ধরতে হাল?
দুপুরে যখন পুরুষ-নারীরা
পুকুর খালে নাইতে যায়
বটের ছায়ায় হয়তো দেখবে
ক্লান্ত রাখাল বাঁশি বাজায়।
আঁধারে পথিক নিরাপদে যেতে
ছড়ায় আলো জোনাকি উড়ে
বাবা-মার কাছে চাটাই বিছিয়ে
কচিকণ্ঠের ছোটোরা পড়ে।
পুবের আকাশে সুরুজ মামাকে
ফিরিয়ে আনে ভোরের পাখি
মিঠে রোদে ঘুরে ফসলের ক্ষেতে
মুগ্ধ নয়নে শিশির দেখি!

রুদ্র বৈশাখে

সুহৃদ সরকার

দীপ কিংবা দীপান্বিতা দীপশিখা যা-ই হও তুমি
তোমার মুখস্মৃতি চিরজাগরুক থাক সকলের মনে,
বুকের ভেতরে তুমি পুষে রাখো বিশ্বাসের বীজ
সে বীজ অঙ্কুরিত বৃক্ষ হোক বেড়ে ওঠা পলাশের বনে।
রুদ্র বৈশাখে হও সান্ত্বনার দীপ্ত সুখছায়া
শ্রাবণের ধারা হও খরতাপ চৈতালি রুক্ষ দুপুরে,
ফাগুনের ফুল হও গোলাপ-চামেলি কিংবা ফুটন্ত ডালিয়া
ঝিকিমিকি তারা হও মেঘমুক্ত নীলাকাশ জুড়ে।
সর্বোপরি মানুষ হও মানবতাসহ এক শুদ্ধ মানুষ
বুকের জমিন জুড়ে চাষ করা ভালোবাসা শুদ্ধ ভালোবাসা,
এ আমার-আমাদের সকলের সম্মিলিত নীত প্রার্থনা
স্রষ্টা তোমার কাছে আমাদের এই শুধু আশা।

রঙের খেলা

জাকির হোসেন চৌধুরী

নতুন ভোরের সূর্যি আলো, ছড়ায় শ্যামল সোনার বাংলায়
বৈচিত্র্যের সমারোহে পৃথিবী রং বদলায়
বর্ষার স্রোতধারায় ধুয়ে যায় কদম-কেয়া
সাদা মেঘের পরতে ভেসে বেড়ায় ধূসর শরৎ
ঢেউ খেলানো সোনালি ধান ডেকে আনে
হেমন্তের নবান্ন।
দুর্বাঘাসে শিশিরে হাসে হিমেল শীতের লজ্জাবতী হাওয়া
শূন্য মাঠে বিচরণ করে যৌবনাবতী বাসন্তী রঙের খেলা।
কৃষ্ণচূড়া আর শিমুলেরা রং ছিটিয়ে
আনে সোনালি বিকেল।
চৈত্রের পাতাঝরা বিবর্ণ বৃক্ষ মাটি ফেটে চৌচির
বৈশাখে পত্রপল্লবে সবুজের সমারোহ
নতুন সাজে সেজে ওঠে প্রকৃতি।
রাখাল ছেলের মোহন বাঁশি
শিল্পীর তুলিতে আঁকে নতুন ছবি।
কুমার পাড়ায় পড়ে যায় ধুম তৈরিতে মাটির বাসনকোসন।

প্রিয়ভাষিণী, মা আমার

শাহীন রেজা

কতটা দূরত্বে তুমি
কতটা ঘ্রাণের স্বর্গ পার হয়ে
তোমার শরীর এখন সুগন্ধী আতর
মৌ মৌ ফাগুন বাতাসে কতটা সাবলীল
উড়ছে আঁচল, তোমার কেশদাম
তুমি কি ফুল খেলেছ আজ
তোমার খোঁপায় জ্বলজ্বল রক্তকরবী
মুক্তির চিহ্ন অপার
প্রিয়ভাষিণী
তুমি তো দুর্গানারী; প্রীতিলতা
বীর কন্যা আমার
তোমার সাহসে ত্যাগে একদিন
ভীরুরাও সাহসী পাইথন
ফুটেছে অযুত ঊর্মি ঘুম যমুনায়
এবং সতত প্রজাপতি এক বারুদের গায়
সেই তুমি কেন আজ আড়ালের ডাকে
কেন আজ লোনাজলে লাল দেহ
ভরসার টিপ
এসো তুমি ফিরে এসো
মা আমার, সন্ধ্যা প্রদীপ হয়ে
তোমার ধ্বনিতে আজ কেবলি ঋদ্ধ সাজে
কেবলি ঐক্য বাজে
প্রিয় বাংলার।

হারানো সুখ

জসীম আল ফাহিম

জীবনের উদ্যমতায় ক্ষয় ধরেছিল আমার। এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি আমার জীবনে একটি অধ্যায় খালি রয়ে গেছে। সময় কেটে গেছে আঠারো বছর। রূপাকে হারিয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম দেশের বাইরে, লন্ডনে। বাবা-মা আজ বেঁচে নেই। তারা তাদের পুত্রধনের শেষ ভালোটুকু দেখে যেতে পারেননি। স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা বাবা-মাকে স্বর্গবাসী করুন।

মনে পড়ে মহুয়া বনের কথা। ওখানে বন্ধুরা মিলে কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি। কোনোদিন আমাদের সাথে থাকত রূপা। সে মাঝেমধ্যে খুব হাসত। হাসিতে ওকে স্বর্গদেবীর মতো লাগত। রূপা আজও কি সেই মহুয়া বনে যায়? ঠিক সেই ভাবে কি সে এখনও হাসে? জানতে বড়ো ইচ্ছে হয়। এতদিন পর আজ আবার কেন জানি আমার মহুয়া বন দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। বাসস্ট্যান্ড এসে স্কুটার ডেকে চলে এলাম মহুয়া বনে। একাকী আমি। আপনমনে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মহুয়া বনে। না, এটা এখন আর বন নেই। মহুয়াকে এখন আর বন বলা চলে না। এখানে চমৎকার একটি পার্ক তৈরি হয়েছে। গেটের পাশে সাইন বোর্ডে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে 'মহুয়া বোটানিক্যাল পার্ক।' রং-বেরঙের ফুল দিয়ে গাছগুলো পার্কটিকে সুশোভিত করে রেখেছে। আর ছোটো-বড়ো হাজার রকমের পাখি নেচে গেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে গাছ থেকে গাছে।

দৃশ্যগুলো বড়োই ভালো লাগল আমার। আমি চলে এলাম পার্কের একেবারে দক্ষিণ পাশে। একটি স্টোন বেঞ্চ অধিকার করে আমি বসে পড়লাম। একাকী নিরালায় বসে বসে কিছু একটা ভাবছি আমি। এমন সময় বোরকা পরা একজন নারী কেমন যেন অনধিকার চর্চা করে আমার বেঞ্চটির অন্য প্রান্ত দখল করে নিল। আমি অবাক! কোনো ফ্যাসাদে জড়াতে যাচ্ছি না তো আবার? মুখের নেকাবটা আলতো একটু সরিয়ে নিল নারী মূর্তি। ওদিকে আমার তেমন মনোযোগ ছিল না। একটি ভিজিটিং কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে নারী মূর্তিটি যেভাবে উদয় হয়েছিল ঠিক সেভাবেই উধাও হয়ে গেল। বিষয়টি নিয়ে কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমি। ফর্সা মুখ। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। কিন্তু অমনোযোগের জন্য ঠিক বোঝা গেল না। কার্ডটির দিকে মনোযোগ দিলাম আমি। একটি বাসার ঠিকানা রয়েছে কার্ডে। ঠিকানা সম্পূর্ণ অচেনা মনে হলো আমার। কিন্তু এ কেমন রহস্য! আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, মহিলাটি নিশ্চয়ই আমাকে চেনেন।

এমন সময় হঠাৎ বাল্যবন্ধু বেলালের সাথে আমার দেখা। সে আমাকে দেখে রীতিমতো অবাক। অবাক হয়েই বলল, কী রে, তুই হারুন না? এখনও তাহলে বেঁচে আছিস।

বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে নিলাম আমি। দুজনে পাশাপাশি বসলাম। একটি ছোটো ছেলে বাদাম বলে হাঁক দিল। কিনে নিলাম পাঁচ টাকার বাদাম। শুরু হলো আমাদের গল্প। জীবনের গল্প। বেলালই প্রথম তার সম্পর্কে বলা শুরু করল।

> বাবা-মা আর দুসন্তান নিয়ে আমার সংসার। তোর ভাবি বড়ো রাঁধুনি। একদিন চল দেখে আসবি। বিআরডিবিতে আমি চাকরি করছি। সংসার ভালোই চলছে। ছেলেটি এমবিবিএস পড়ছে। আর মেয়েটি এবার এসএসসি দিবে।

বন্ধুর সুখের কথা শুনে আমার ভালোই লাগল। আমার দুচোখ তখন সুদূর নীলিমায় গিয়ে ঠেকল। নিজের জীবনের কথা ভেবে আমার চক্ষু দুটি স্থির। সিগারেট ধরেছিলাম সেই ছাত্র জীবনে। ধরালাম একটি সিগারেট। চারদিক ঝাপসা করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

বেলাল হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে বলল, কী রে, কী হলো তোর? আমার কথা তুই শুনতে পাচ্ছিস? বেলাল আবার বলল, আচ্ছা হারুন, ভাবির কী খবর? তোদের ছেলেমেয়ে কজন? বাচ্চারা এতদিনে নিশ্চয়ই অনেক বড়ো হয়ে গেছে।

মনের অজান্তে আমার বুক ছিঁড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বললাম, বন্ধু রে! পৃথিবীতে কিছু ভাগ্যাহত মানুষ থাকে। আমি তাদেরই একজন। বিয়ে করার মতো সৌভাগ্য আমার হয়নি। বাচ্চা-কাচ্চা আসবে কোথা থেকে?

আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বেলালের মুখমণ্ডল সহসা ম্লান হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর সে বলল, আচ্ছা হারুন, রূপার কী খবর? ও এখন কোথায় আছে? শুনেছিলাম তোর সাথে ওর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক।

বিষণ্ন কণ্ঠে আমি বললাম, জানি না বেলাল। আমি কিচ্ছু জানি না। ওসব আমাকে জিজ্ঞেস করিস না বন্ধু। দয়া করে আমায় ওর ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন করিস না। বলেই আমি উঠে পড়লাম। বললাম, চল ফেরা যাক। অন্য কোনোদিন আবার হয়তো আমাদের দেখা হবে।

বেলাল বুঝতে পারল আমার মনটা আজ বিশেষ ভালো নেই। তাই কথা বাড়ালো না সে। যাবার বেলা বেলাল আমাকে তার বাসার ঠিকানাটা দিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এলাম আমি। একটি পুরাতন গিটার ছিল আমার। একসময় বেশ বাজাতাম। আজ কেন জানি একটু বাজাতে খুব মন চাইল। কী একটা অচেনা সুর বাজাতে লাগলাম আমি। সুরটা ব্যথার নাকি সুখের ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবু আমার চোখ দুটো অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেল। বেলালের বাসায় আমার কখনও আর যাওয়া হলো না। কারণ ওর ঠিকানাটা মানিব্যাগের পকেটে আর খুঁজে পেলাম না।

আজ হঠাৎ মহুয়া পার্কের অজ্ঞাত রমণীটির কথা আমার বার বার মনে হতে লাগল। কেন মনে পড়ছে তার সঠিক কারণ আমার জানা নেই। তবু রমণীটিকে আরেকবার দেখার জন্য আমার মনটা হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মনকে দমন করতে না পেরে আমি ঠিকই গিয়ে পৌঁছলাম সেই রমণীর বাসায়। দ্বিতল সুন্দর পাকা বাড়ি। চারপাশে দেয়াল ঘেরা। গেটের একপাশে রয়েছে মার্বেল পাথরে ক্ষুদিত নেমপ্লেট। তাতে লেখা রয়েছে 'মনোরঞ্জন ভবন'। আমি গেটের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। 'মনোরঞ্জন'! তবে কি এই মহিলা প্রমোদকন্যা? পরে ভাবলাম, থাক, এসেছি যখন ভেতর মহল একবার দেখে যাই। কলিং বেল চাপতেই বারো-তেরো বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে গেট খুলে দিল। আমি থ হয়ে গেলাম। ঠিকানাটা কি তাহলে ভুল! পকেট থেকে কার্ডটি বের করে মিলিয়ে দেখলাম। না, ঠিকই আছে। তবে একি দেখছি আমি! মেয়েটিকে ভদ্র ঘরের সন্তান বলেই আমার মনে হলো। মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে বলল, মনোরমা।

আমি বললাম, মনোরমা! বাহ্ খুব সুন্দর নাম তো! আচ্ছা মনোরমা, তোমার কে কে আছেন?

মনোরমা বলল, মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

আমি বললাম, তোমার মায়ের সাথেই আমি দেখা করতে চাই।

মনোরমা আমার দিকে ভালো করে একবার তাকালো। তারপর সে আমাকে ভেতর মহলে নিয়ে গেল। বাসার নিচতলার কক্ষটিতে মনোরঞ্জন অফিস আর দোতলায় তারা থাকে। আমাকে ঠিক দোতলাতেই নিয়ে গেল মনোরমা। কার্ডে লেখা ছিল মনোরমার মায়ের নাম, রূপায়ণ।

আমি ওদের গেস্ট রুমে একটি সোফা অধিকার করে বসলাম। মনোরমা ওর মাকে খবর দিতে গেল। ঘরের ভেতরটা দেখে আমার মনে হলো, এখানে আভিজাত্য আছে ঠিকই তবে কেমন একটা নিস্তেজতা বিরাজমান। কেমন যেন খাপছাড়া একটা ভাব। তবু পরিবারটি যে সচ্ছল তা প্রথম দর্শনেই আমি বুঝে গেলাম।

মনোরমা এসে মিষ্টি করে বলল, আপনি বসুন। মা এখনি চলে আসবেন। আমি এখন একটু নিচে যাব। বলে মনোরমা সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগল।

একটি গুমোট নীরবতা সমস্ত ঘরটিতে বিরাজ করছিল। টেবিলে রাখা খবরের কাগজে আমি চোখ বুলাচ্ছি। এমন সময় ছাদ থেকে একটি বুড়ো টিকটিকি লেপটে পড়ল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে খসে গেল ওর লেজ। নাচতে নাচতে ছিন্ন লেজখানি ঢুকে গেল টেবিলের নিচে। টিকটিকিটা দৌড়ে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। যেন তার বিপদ কেটে গেছে। আমি টিকটিকিকে নিয়ে ভাবছি। খবরের কাগজ আমার হাতেই ছিল। এমন সময় একটি মেয়েলি কণ্ঠ শুনে আমি চমকে উঠলাম। 'কেমন আছ হারুন?'

কণ্ঠের চিরচেনা আবেদনে আমি সেদিক ফিরে তাকালাম। নিমিষেই আমার সারা শরীর কেমন যেন শীতল হয়ে গেল। পলকহীন চোখের কোণে মনের অজান্তেই জমা হলো কয়েক ফোঁটা অশ্রু। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দিলাম, 'যেমন তুমি চেয়েছিলে।'

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি রূপার মুখোমুখি বসে আছি। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর চোখ দুটোও অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। এ অশ্রু বিষাদের নাকি আনন্দের ঠিক বোঝা গেল না। তবে রূপার বুক ছিঁড়ে একটি তীব্র দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। রূপার হাতে ট্রে। তাতে কিছু মিষ্টি খাবার এবং ফলমূল। ট্রেখানি টেবিলে পরিবেশন করে রূপা বলতে লাগল, অনেক দিন পর হঠাৎ সেদিন তোমাকে পার্কে দেখে আমি অবাক হলাম। কতদিন তোমাকে দেখি না! মনটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। ভাবলাম, বসে কিছু সময় গল্প করি। কিন্তু সাহস হলো না। তাছাড়া আমার জন্যই তো তোমার আজ এমন দশা হয়েছে। ভেবে নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হলো। ভাবলাম, ঠিকানাটা দিয়ে যাই। তোমার ইচ্ছে হলে নিশ্চয়ই একদিন আমার বাসায় আসবে। বলতে বলতে রূপার কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল।

রূপা যে আমাকে চিনেই ঠিকানাটা ধরিয়ে দিয়েছিল এখন তা স্পষ্ট হলো। বললাম, ওসব আর টেনে লাভ কী? দুঃখই শুধু বাড়বে। আমাকে ঠিকানাটি না দিলেও তো তুমি পারতে। কেন দিয়েছিলে?

রূপা বলল, হারুন, তোমাকে আমি অনেক দিন থেকেই খুঁজছি। একদিন না একদিন তোমাকে যে আমি পাবো– এই বিশ্বাস আমার মনে ছিল। এ জন্যই হয়তো সেদিন পেলাম। মনটাকে ধরে রাখতে পারছিলাম না বলেই তোমাকে কার্ড দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, তোমার মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী। ওর বাবার কী হয়েছিল?

এমন সময় মনোরমা এসে রুমে ঢুকল। রূপা মনোরমাকে ডেকে বলল, মনু! উনি তোমার চাচা হন। এতদিন দেশের বাইরে ছিলেন। চাচাকে সালাম করো।

মনোরমা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। আমার পায়ে হাত দিয়ে সে কদমবুসি করল। ওর নিষ্পাপ মুখের হাসিতেও কেমন যেন মলিনতার ছাপ সুস্পষ্ট। রূপা আবার বলল, মনুর বয়স যখন পাঁচ, তখন ওর বাবার স্ট্রোক হয়। সেই থেকে ওর মুখে আমি আনন্দের হাসি খুব কমই দেখেছি। ওর কচিমনে হয়তো বাবার মৃত্যুটা শক্তভাবে রেখাপাত করেছিল।

মনোরমার জন্য আমার মনটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। ভাবলাম, হায় রে ভাগ্য! রূপার এই কচি মেয়েটি আমার সন্তানও হতে পারত। হলো না কেন? কী এমন অপরাধ করেছিলাম আমি অথবা রূপা? মনুকে আমার পাশে এনে বসালাম। আলতো করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে আমি রূপার সাথে নানা আলাপচারিতায় মেতে উঠলাম। আমার অনেক কথা হয়েছিল সেদিন রূপার সাথে। রূপাকে আমি সেদিন যেমন দেখলাম, তাতে ওর সৌন্দর্য কোনো অংশেই কম মনে হলো না। বুঝতে পারলাম, বয়স বাড়লেও এখনও ফ্যাশন সচেতন রূপা।

এরপর থেকে প্রায় দিনই আমি রূপার বাসায় বেড়াতে যেতাম। কিন্তু মনুকে ডেকেও কাছে পেতাম না। রূপা সেদিন বলল, মনু অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। ও ভালো নাচতে পারে। নিচে মনোরঞ্জন কক্ষে সপ্তাহে দুদিন চলে ওর নৃত্য প্রদর্শনী। শহরের ধনাঢ্য লোকের সন্তানরা আগে থেকেই টিকেট সংগ্রহ করে ওর নাচ দেখতে আসে। সেই মনোরঞ্জন বন্ধ করে দেবার জন্য শহরের একটি মহল ইদানীং খুব মেতে উঠেছে। স্কুল থেকে ফেরার পথে কয়েক বার মনুকে ওরা হুমকি-ধামকিও দিয়েছে। মনুর নৃত্য প্রদর্শন বন্ধ না করলে ওরা নাকি ওকে এসিডে ঝলসে দেবে। তাই মনু বাসায় ফিরে কাঁদত। বাবার কথা মনে করে কাঁদত। ওর বাপ বেঁচে থাকলে হয়তো ওরা এত সাহস পেত না।

আমি রূপার কথা শুনে খুব অবাক হলাম। একটি স্বাধীন দেশের মানুষের মনের স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেওয়া হচ্ছে। এ যে বড়ো অন্যায়। কিন্তু কে বুঝবে এ বিষয়? কিন্তু আমি এখন কী করতে পারি? কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি আবার কে? তখন আমি কী জবাব দেব? রূপা-মনুর কথা ভেবে আমার মনটা কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল।

অন্য একদিন আমি রূপার সাথে কথা বলছিলাম। একথা, সেকথা, অনেক কথাই হলো আমার। সেদিন রূপা একটি প্রশ্ন করে আমাকে পুরনো সেই দিনগুলোতে নিয়ে গেল। আশাতীতভাবে রূপা বলল, আচ্ছা হারুন, তুমি বিয়ে করনি কেন? এতদিনে তোমাকে অবশ্যই সংসারী হওয়া উচিত ছিল।

রূপার এমন প্রশ্নের আমি যে কী জবাব দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তবু বললাম, আমি আমার কথা তো রক্ষা করতে পেরেছি। এটাই কি যথেষ্ট নয়? আর দশজনের মতো আমি হতে পারিনি। তাই তোমায় দেওয়া কথা আজও রক্ষা করে চলেছি।

রূপার দুচোখ জলে ভেজা। কী যেন ভাবছে সে, আর আমার কথা শুনছে। আমি আবার বললাম, পৃথিবীর অনেক মা-বাবা সন্তানের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেন। শুধু আমাদের বেলাতেই ঘটল তার উলটো। রূপা, আমরা মা-বাবার অবাধ্য হয়ে পরস্পরকে বিয়ে করে সুখী হতে পারিনি। যদিও সেদিন বংশমর্যাদা ও সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন নিয়তিকে দোষ দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।

রূপা চোখ তুলে তাকালো। সে চোখে অনুতাপ আর অনুশোচনার জল ঝাপসা হয়ে আছে। রূপা বলল, হারুন, চলো না আমরা আবার হারানো দিনগুলোতে ফিরে যাই। হারানো সেই সুখ ও ঐশ্বর্যকে চলো না আবার ফিরিয়ে আনি। ইচ্ছে করলে কি আমরা সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারি না? তুমি, আমি, আমাদের মনু– একটি নতুন জগৎ কি আমরা আবার সৃষ্টি করতে পারি না?

রূপার কথায় আমার কোনোকালে দ্বিমত ছিল না। ওর ইচ্ছাকে আমি বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। যার জন্য আমি জীবনের উদ্যমতা হারিয়ে তারুণ্যময় জীবনটাকে দুঃখ-যন্ত্রণায় ভরে তুলেছিলাম, আজ তার জন্য আমি এটুকু করতে পারব না! তা কি কখনও হয় নাকি? জীবন থেমে নেই। জীবনপ্রবাহে আবার আমরা জীবনতরী ভাসিয়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হলাম।

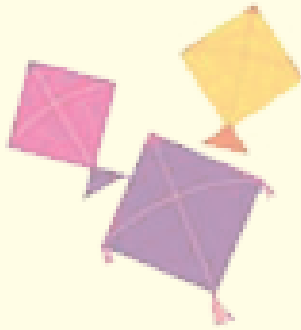

নববর্ষ আসে বাংলার ঘরে

নূরুল হক

নববর্ষ আসে নব উদ্ভাসে
অগ্নিপোড়া মাসে নববর্ষ আসে
ফুলে আর ফলে বৃক্ষচূড়ায়। নন্দিত ঘাসে
সমূলে বিনাশ করে হীনম্মন্য, নববর্ষ আসে
তিতুমীর, সূর্যসেন আর আমার রাখালিয়া দেশে
নবরঙ্গরসে নবতর বেশে অন্তর ভালোবেসে
দীপ্ত পায়ে উড়িয়ে বিজয় কেতন নববর্ষ আসে
ঠোঁটে ধরে ঝড় মহা আক্রোশে দুর্নিবার ত্রাসে
সেজেগুজে আখি বুজে
রঙিন তরমুজে
আমার শ্যামল দেশে বারবার নব রঙ্গে নব হর্ষে
এসো অবগাহি একসঙ্গে আজ নতুনত্বে নববর্ষে
চৈতি ফুলের সৌরভে ভর করে
নানা সুষমায়
নববর্ষ আসে বাংলার ঘরে
এই সমতটে রঙিন প্রহরে।

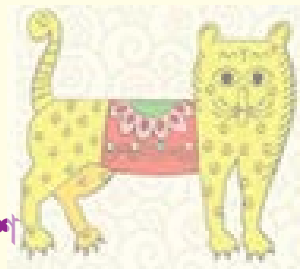

উল্লাস-উচ্ছ্বাসে বেঁচে আছি বেশ

শাহনেওয়াজ চৌধুরী

উল্লাস-উচ্ছ্বাসে বেঁচে আছি বেশ,
যখন-তখন ছুটে যাই জ্যোৎস্নাডোবা মাঠে
শিস দেই, গান গাই– কে রুখতে পারে?
চলতে চলতে সবুজ ধানক্ষেত দেখি
পথের দু'ধারের বাড়িঘরে–
এক চিলতে সরু পথ গিয়ে আছড়ে পড়েছে
ছোট্ট উঠোনের কোলে।
উঠোন ছুঁয়ে আছে ঈগলের চোখের মতো
টলটলে জলের পুকুর।
ওইটুকু উঠোনে কলাপাতা রোদের সকালে
কিংবা জ্যোৎস্নাডোবা রাতে কী যে সুখ!
এই সুখানুভূতি রুখে দেবে এমন ক্ষমতা
এখন আর উপরওয়ালা ছাড়া আর কারো নেই।
কেননা আমরা এখন মন খুলে গাইতে পারি
হৃদয় খুলে ভালোবাসতে পারি!
আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক।
স্বাধীনতা আছে বলেই–
উল্লাস-উচ্ছ্বাসে বেঁচেবর্তে আছি বেশ।

বৈশাখ আমি

সাঈদ তপু

বৈশাখ আমি, তাইতো আমার গর্ব যে হয় ভারি
আমার কাছে কৃষ্ণকালো গুরুগম্ভীর মেঘ
আমি হলাম কবিগুরুর উত্তরাধিকারী
দৃপ্ত লয়ে ছুটি, আমার ক্ষিপ্র গতিবেগ।
তীব্র মেঘের গর্জনীতে, দূর করে সেই আঁধার
আকাশ ফেটে মর্ত্যলোকে ওঠে রবির আলো
ভাঙা কপাট, চূর্ণ পথের নতুন স্বপ্ন বাঁধার
আজ যে তোমার দীপ্ত চোখে, নিত্য প্রয়াস ঢালো?
সবটুকু যে তার অবদান, জন্ম আমার ধন্য
এই পৃথিবীর আলোকছটা, অনেকটা তার জন্য।
আমায় বলো? চিনতো কে আজ ছিলাম নবীন বেশে
আমার নামের জৌলুস কী, পঁচিশের আগে
রবির আলোয় নামটি থাকে সবার অগ্রভাগে।
এসো এসো বলে আমায়, গুরু যখন ডাকে
তখন আমার ঠাঁই শুধু নয়, পাখপাখালির বনে
আমায় নিয়ে গান, কবিতায় ব্যস্ত সবাই থাকে
এখন আমার ঠাঁই যে সবার, মনের গহীন কোণে।

নিভৃত ভাবনা

কবির আহ্‌মেদ

জ্যোৎস্না-প্লাবিত এই সন্ধ্যায়
নিঝুম নিরালায় এ জীবনকে ভাবি।
কখন যে কেটে গেল জীবনের দিন
কিছু জানা বা বুঝার আগেই
কোনো কিছুই গুছানো হলো না
সাজানো গেল না সখের বাগান খানি
জীবনের খেলাঘরে।
তবুও আক্ষেপ নেই
যখন ভাবি কত মানুষের জীবন
আমার চেয়েও দুঃখ-যন্ত্রনায় ভরা
তখন স্রষ্টার অপার মহিমার কথা ভাবি
আমিতো ভাগ্যবান এক অগণিত মানুষের মাঝে।

বৈশাখের দিন

মোহাম্মাদ ইলইয়াছ

চৈত্রের শেষ দিনে বেজেছিল বিদায়ের বাঁশি
গেয়েছিল কোকিল, নতুনের গান, নতুন পাতার ফাঁকে।
বসন্ত গেছে, এল বৈশাখ, পল্লবে পল্লবে তারই ধ্বনি
এসো আজ পদ্মপুকুরে, নদীতে ঢেউ খেলানো ছবি আঁকি।
বৈশাখের প্রথম দিনে বেজেছিল খোকনের চিকনবাঁশি
উৎসবে-মেলায় নাগরদোলায় চড়েছিল গায়ের ছেলেরা
পুতুল-বাঙ্গি খেলনা কিনেছিল নয়া দিবসে খোকারা
আজ ঘুড়ি উড়বে আকাশে, সার্কাস খেলবে হাতি-ঘোড়া-বানর।
আজ বৈশাখের দিন, আজ ভালোবাসা ও মেলবন্ধনের দিন
কী হারালাম, কী পেলাম বিগত ক্ষণের-বেদনার নীড়ে
তার কালখাতা দেরাজে থাক, এসো হালখাতা খুলি
ভুলি নতুনের আবাহনে, নতুন সূর্যের প্রত্যাশায় এবং স্বপ্ন-ধ্যানে।

বোশেখের আহ্বান

খান চমন-ই-এলাহি

এই দিন বোশেখের, উৎসব বোশেখের
এই স্মৃতি এই নস্টালজিয়া বোশেখের।
ঘন কাল মেঘ, ঈশান কোণের ঝড়
কাঠ-ফাটা রোদ, চৌচির মাঠে
ধুলোময় শহরে এক পশলা বৃষ্টি
সে-ও জানি বোশেখের।
ভাটির নদী উজানে ফেরে,
জল থই থই স্বপ্নরা হাওর-বিলে
পঞ্চদশী বালিকার টোলহীন গালের মতো
কিংবা তার ভরাট বুকের মতো
বোশেখেই কলা করে।
একতারা-দোতারা, বাউলের বাঁশি
রমনা–ঘাঘর, বটতলা ফেরা বাঙালির হাসি
এ যুগের রাধা, এ যুগের কৃষ্ণ-গলে
হয়ত অলক্ষ্যের ফাঁসি।
ভরা জল-নৌকাবাইচ
ষাঁড়ের আড়ং, নানা আয়োজন
পূণ্য-স্নান, শিশুর বায়না শিশুর খেলনা
এই সব ফিরে দেখা মায়াবী খেলনা
এই সব ফিরে দেখা মায়াবী ক্ষরণ
বোশেখের উদ্‌বোধন থাকে আমরণ!
বোশেখের গান বাঁধে প্রাণ
বাড়ায় মনলোভা আয়ু
আর কুটুমবাড়ি পাঠায় খবর
সেবন করে নতুন বায়ু।
বোশেখের হালখাতা বোশেখের লালখাতা
বোশেখের নিকাশ আর মিষ্টি বিলাস
নতুন বছরের আহ্বান-
নিকষ অন্ধকার বুকের গহিনে জ্বালা
মঙ্গল প্রদীপ-শিখা চিরন্তন।

সবকিছু পরিবর্তন

বাবুল তালুকদার

নতুন দিনের আলো বইছে বাঙালির বুকে
স্বপ্ন ধ্যান, ধারণা উত্তরাধুনিক থেকে আধুনিক
বদলে যায় তরুণ-তরুণির স্বপ্ন ও ভালোবাসা
ছক্কা মারতে-মারতে সীমানা পার করে আপন খেয়ালে,
তাবৎ পৃথিবীর বুকে।
যন্ত্রণা বলে হৃদয় গহীনে কিছু নেই,
মূহুর্তের যেন সবকিছু
পূর্ণতা খুঁজে পায়
যেমন রং তুলিতে শিল্পী শান্তি খুঁজে পায়
কবি তার লেখনী দিয়ে সমাজ পালটে দেয়
খুলে দেয় চোখ
সৌন্দর্য ও শান্তি ফিরে পায় ছিন্নমূল মানুষ
সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে যায়
স্বপ্নের বাংলাদেশ।

বাংলার রূপ

মিলি হক

পান্থ পথিক আমি ঘুরি দেশে দেশে
নস্টালজিয়া স্মৃতি কাতর জীবনানন্দের দেশে
কখনো নজরুল হয়ে পাহাড়ে হেলান দিয়ে
বৈধব্য চাঁদ দেখে ক্লান্ত হই শেষে।
নদী তীরে কুলবধূ ঘোমটা টেনে
চলে যায় মেঠো পথে কোন গৃহ কোণে?
জিজ্ঞাসি নাম তার কৌতূহল বসে
বেগানা মানুষ দেখে এলিয়েন ভাবে।
কর্ষিত মাটিতে সরিয়া ফলে
সোনাধান ঘরে তুলে নবান্ন হলে
নাইওর যায় বধূ ভাটিয়ালি গেয়ে
মন তার উচাটন ফেলে আসা নাগরে।
বৈরাগ্য মন নিয়ে একতারা হাতে
সমুদ্র সবুজ জল ধু ধু বালু তীরে।
দূরের কোন সীমানায় কোকিল ডেকে যায়
ডুবু ডুবু খেয়া নিয়ে নদী পার হয়
কী অফুরন্ত ভালোবাসায় ছুয়ে যায় মন
রেখে গেলাম চরণ চিহ্ন এই বাটে
আমার বাংলাদেশের মাঠে-প্রান্তরে।

হালখাতা

রুস্তম আলী

নতুন বছর নতুন প্রস্তুতি
বাঙালির ঘরে ঘরে।
প্রকৃতি ফুলে-ফলে সেজে-গুজে
মৌ-মৌ গন্ধে ভরপুর।
স্বপ্ন দেখে বাঙালি-অলস দুপুরবেলা
বছর ঘুরে আসবে আবার মেলা।
খোঁপায় বেলীফুলে সেজে-গুজে
চলছে কিশোরী
বকুল তলে বাজে বাঁশরি।
কালিমাখা মেঘ আচমকা ঝড়ো হাওয়া
হঠাৎ পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যায়।
বৃষ্টি এসে-
সারা বছরের কালিমা ধুয়ে-মুছে
নিয়ে যায়।
জীবনটা সুন্দর হয়ে যায় নববর্ষে।
বাঙালি হয়ে উঠে মোগল সম্রাট।
ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িকতার
প্রতিশ্রুতি দেয় বাঙালি।
সকালে নাস্তা ভর্তা-পান্তা
জীবনটা চাঙ্গা।

বৈশাখ জাগো

অসিত কুমার মন্ডল

বৈশাখ জাগো রক্তে আমার জাগো চিত্ত-বীণায়;
বৈশাখ জাগো শিরায় শিরায়, অস্থি-মজ্জা-সিনায়।
বৈশাখ জাগো কণ্ঠে আমার বজ্র-কণ্ঠের হাঁকে;
বৈশাখ জাগো রৌদ্র-তপ্ত, সপ্ত-দোলার পাকে!
বৈশাখ জাগো কণ্ঠ-বীণায়, অগ্নিবীণার সুরে;
বৈশাখ জাগো বৃক্ষ-লতায়-কানন-শৈল চুড়ে।
বৈশাখ জাগো অগ্নিগিরির অগ্নিশিখা জ্বেলে ;
বৈশাখ জাগো দ্বাদশ রবির, তপ্ত-কিরণ ঢেলে!
বৈশাখ জাগো তাথৈ তাথৈ দ্রিমিদ্রিমি ছন্দে;
বৈশাখ জাগো তাণ্ডব নৃত্যে-নৃত্য-পাগলানন্দে!
বৈশাখ জাগো জয়ভেরি বাজিয়ে রণবাদ্য;
বৈশাখ জাগো অসাধ্য সাধনের অজেয় দুঃসাধ্য!
বৈশাখ জাগো রক্ত-নিশান উড়িয়ে মহাকাশে;
বৈশাখ জাগো লতা-গুল্ম, সবুজ-শ্যামল ঘাসে।
বৈশাখ জাগো হৃদয়ে হৃদয়ে সত্যের আলো জ্বেলে;
বৈশাখ জাগো অন্ধকারের বন্ধ-কারা ঠেলে।
বৈশাখ জাগো রক্তোল্লাসে লেখকের লেখনীতে;
বৈশাখ জাগো কাব্য-বীণায় সুর-ছন্দ-গীতে।

পহেলা বৈশাখ

আবুল হোসেন আজাদ

চৈত্র সংক্রান্তি পেরিয়ে
কালের সমুদ্রের অতলে তলিয়ে
আরও একটি বছর। ফেলে আসা সরিয়ে
এল পহেলা বৈশাখ নতুন স্বপ্নের বারতায়।
দোকানে শুভ হালখাতা
মাঠে নয়া ফসলের অপেক্ষায় গাঁয়ের কৃষক
চারদিকে খুশি উতরোল
নতুন করে পথ চলা শুর“র এই তো সময়।
বৌ কথা কও ঘুঘুর গানে গড়ায় দিন
গাছের কচি সবুজ পাতা দোল খায় বাতাসে
কৃষাণ বৌয়ের মাটির ঘর দুয়ার নিকানো
কাঁচা পিঁয়াজ, লঙ্কা, ভর্তার সাথে পান্ড়া ভাত
কচিৎ মাছের সংযোজন বাড়ন্ড় স্বাদ।
সোনালি পাকা বোরো ধানে ভরা মাঠ
ধান কাটার অপেক্ষায় হৃদয়ে খুশির ফাগুন
হঠাৎ কাল বৈশাখি ঝড়
হাসির ঝিলিক মিলায় দুশ্চিন্ড়ার করালে
ঝড়ের সাথে নামলে শিলাবৃষ্টি।
তবু বৈশাখ আসে
একটি স্বপ্ন জোছনার নতুন প্রত্যাশায়
নতুন উদ্যমে যাত্রা শুর“ করা
হতাশার বেড়াজাল ছিন্ন করে।

মনের কানন

তাহমিনা বেগম

আম্র কাননে লেগেছে নৃত্য
তা দেখে মন ভরে যায় হাসে চিত্ত
ফুলে-ফলে শোভিত বৃক্ষরাজি
মনেতে দোলা লাগে স্বাগতম হে বৈশাখ।
বাঙালির প্রাণকে পহেলা বৈশাখ করে উজ্জীবিত
মনের হরষে সাদা-লালের বৃত্তে তোমায় করি সুসজ্জিত
এ যেন এক ভরা যৌবনের মতো দেদীপ্যমান
অবগাহন করি তোমাতে সদা ওহে বাঙালির প্রাণ।
ধনী নির্ধন নির্বিশেষে তুমি সবাতে প্রবাহমান
চিত্ত থেকে বৃত্তে নও তুমি বন্দি
যেথায় খুশি সুস্বাগতম তোমায় বাঙালির নন্দন আসো
তুমি আসো ভরে দাও মনের কানন।

এক সন্ধ্যার গল্প

দেলোয়ার হোসেন

ঢিল ছুড়লে যতটা দূরত্ব ঠিক ততটাই দূরত্ব কবির বাসা থেকে বাসস্ট্যান্ড। এতটুকু পথ হেঁটে গিয়েই বাস ধরেন কবি সফিক সাহেব। তিনি একটি পত্রিকার সিনিয়র সম্পাদক। সোমবার তার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। দীর্ঘদিন তিনি একাই বাস করেন তার ফ্ল্যাটে।

ছুটির দিন বাসায় একা একা সময় কাটতে চায় না। আবার ঘর ছেড়ে বাইরে যেতেও সায় দেয় না মন। কেবলই ভাবেন, কেউ যদি এসে ফিরে যায়। তবে তিনি অকারণেই পায়ে পায়ে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ান। কখনো চায়ের দোকানে বসেন। তবে চা খান না তিনি। মাঝে মাঝে এক খিলি পান মুখে পুরে আবার ফিরে আসেন বাসায়।

আজও লাঞ্চ শেষ করে ইজি চেয়ারটায় বসলেন কবি। কিছুক্ষণ চোখ রাখলেন খবরের কাগজে। তারপর টেবিল থেকে টেনে নিলেন 'আল কুরআন, বাইবেল ও বিজ্ঞান' বইটি। পাতা উলটাতে উলটাতে ভাবলেন, আমাদের সমাজ আজ কোন দিকে ছুটে চলেছে। মানুষের মনুষত্ব এখন অনেকখানি মুচড়ে গেছে। এখনি প্রচণ্ড গতিতে রুখে দাঁড়াতে না পারলে ধেয়ে আসা উন্মত্ত ঢেউয়ের ফণা সবকিছু গুঁড়িয়ে দেবে। মন, মানুষ আর আমাদের এই সমাজটাকে টেনে নিয়ে যাবে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গে। সেখানে বোবা কান্না ছাড়া আর কিছুই নেই।

ভাবতে ভাবতে কবি চেয়ার ছেড়ে পায়চারি করলেন, আনমনে গিয়ে দাঁড়ালেন বেলকনিতে। ফিরে এসে আবার বসলেন চেয়ারটাতে। চোখ বন্ধ করে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। ঘুম নামল কবির চোখে। ধীরে ধীরে সূর্য গিয়ে দাঁড়ালো পশ্চিম দিগন্তে। বিকেলের সোনারোদ এসে পড়েছে কবির পশ্চিমের বেলকনিতে। এর মধ্যেই কলিংবেল বেজে উঠল। কবি তখনো ঘুমে। আবার বাজল। ঘুম ঘুম চোখে কবির মনে হলো কেউ যেন বেলের সুইচটা চেপে ধরে আছে। কবি চোখ রগড়ে চশমাটা পরে এগিয়ে গেলেন দরজার সামনে। মুহূর্তে মনে করার চেষ্টা করলেন, আজ কারো আসার কথা ছিল কি? তেমন কিছু মনে পড়ল না। কোনো শব্দ না করে তিনি দরজা খুলে দিলেন। খুলেই অপলক চেয়ে থাকলেন। সুরেখা মুখের উপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে বলল, চিনতে পেরেছ? যাদের কথা মনেই রাখ না তাদের কি আর এত তাড়াতাড়ি চেনা যায়! কবি শুধু মিষ্টি করে একটু হাসলেন। অবশ্য সুরেখাকে দেখে আনন্দে হো-হো করে হাসতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু তিনি মনকে শান্ত রেখে মিষ্টি হেসে বললেন, আয়। আজ কেন জানি বার বার মনে হচ্ছিল কেউ একজন আসবে, যাকে আমি খুব দেখতে চাই। সাত বছর পর আসলি, তাই না? তুই হয়তো জানিস না এই সাত বছরের প্রতিটি সোমবার আমি ফ্ল্যাটেই থাকি। মিছেই আশা করতে থাকি তুই আসবি। অবশ্য আজ কারো মুখ আমার মনে ভাসেনি।

–এখন আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে আমি না হয়ে অন্য কেউ হলেই ভালো হতো?

–এই যে হঠাৎ এসে তুই আমাকে এত বড়ো একটা সারপ্রাইজ দিলি, ঠিক এভাবেই মানুষের মনও মনের মানুষটাকে হঠাৎ অবাক করে দিয়ে আনন্দ পায়। তুই এতদিন পর আসবি, আমি বাসায় আছি কি-না, সেজন্য একটা ফোন করতে পারতি কিন্তু তা না করেই চলে এলি। কেমন আছিস সে প্রশ্ন করব না। আমার বিশ্বাস, আমার মেয়েটা অবশ্যই ভালো আছে।

–কেন ফোন করব? আমি তো জানি ছুটির দিন তুমি কোথাও যাও না।

সুরেখা ড্রইং রুমটার চারদিকে দৃষ্টি ঘোরালো। তারপর সোফায় বসতে বসতে বলল, আব্বু তুমি কি আমাকে দেখে অবাক হয়েছ? কবি বললেন, অবাক হইনি তবে হঠাৎ আনন্দে বুকটা ভরে গেছে। যে আনন্দ কল্পনার মধ্যে গুছিয়ে রাখা যায় না। সুরেখা মনে মনে পুলকিত হলো। বলল, তুমি আনন্দ পেয়েছ তোমার মেয়েকে দেখে নাকি আমার এই পরিবর্তন দেখে! কবি বললেন, খোলামেলা পোশাক ছেড়ে দিয়েছিস বলে তোর মা রাগ করে না? সে কি জানে তুই আমার কাছে আসবি?

–মায়ের কথা রাখ। এতদিন পর আমি কেন এলাম তা জানতে চাইলে না?

–এতদিন পর মা তার ছেলেকে দেখতে এসেছে, এর মধ্যে কেন এসেছিস এ কথা টানতে হবে কেন!

–আমি এসেছি তোমার সাথে ঝগড়া করতে।

–সে পরে হবে। এখন কি কিছু খেতে চাস? ঘরে চা, কফি, মুড়ি, চানাচুর, ফল আর ভালো কেকও রয়েছে। যা তোর মন চায়। আমি ওজু করে নামাজটা পড়ে আসি। তুই বস।

কবি চলে গেলেন। সুরেখা সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে বলল, তুমি এত ভালো কেন আব্বু! নিজের কষ্টগুলো কত সহজ করে লুকিয়ে রাখ। আর আনন্দটা ভাগ করে নাও সবার সাথে। তোমাকে এখন আমি বেশ বুঝতে পারি। গর্বে আমার বুক ভরে যায় এই ভেবে যে, আমার আব্বু কত বড়ো মাপের একজন মানুষ। মায়ের কোলঘেঁষা হয়ে আমিও না বুঝে কথায়, আচরণে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি।

চোখ দুটো কেমন ভিজে উঠল সুরেখার। তারপর সেও গেল অন্য বাথরুমে। কবি নামাজ শেষ করে বসবার ঘরে এসে মেয়েকে না দেখে এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে। সেখানেও না দেখতে পেয়ে ছুটে গেলেন অন্য ঘরে। দরজা থেকেই চোখ পড়ল কাচের আলমারিটার ওপর। আলমারির একটা পাল্লা খোলা। আর একটু এগিয়ে দেখেন, সবচেয়ে সুন্দর জায়নামাজটা পেড়ে তার মামণি সুরেখা নামাজে নিমগ্ন। এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে কবি সহসা সরতে পারলেন না কিছুতেই। তারপর তিনি ঢুকলেন রান্নাঘরে। আপেল কাটলেন, কেক আর চানাচুর প্লেটে রেখে ফ্লাস্কে

কফি ঢালতে যাবেন ঠিক তখনই মেয়ের কণ্ঠ কানে এল।
–তুমি এসব করতে এসেছ কেন? তুমি কেন বড়োদের মতো হতে চাও না। টেবিলে গিয়ে বসো আমি নিয়ে আসছি। কবি কোনো প্রকার শব্দ না করে চলে এলেন। সুরেখা গলা বাড়িয়ে বলল, তুমি কি বরাবরের মতো কফিতে চিনি খাও?
–এখন খাই না। মিষ্টির চেয়ে তেতোই ভালো লাগে। তাছাড়া বুড়ো হয়ে গেছি না!
সুরেখার শাসন আর হুকুম পালনের মধ্যে কী যে অমৃত সে কথা কবি ছাড়া আর কে বেশি বুঝবে। তখনই কবির মনে পড়ে গেল ছোটোবেলায় পড়া সেই কবিতার একটা লাইন– 'অমৃত স্বাদ লভিয়াছি যেনো মায়ের বকুনি খেয়ে'।
কফিতে চুমুক দিয়ে সুরেখা বলল, আব্বু, এই যে তুমি একা একা এত বড়ো ফ্ল্যাটে থাকছ, সত্যি কি তোমার ভালো লাগে? কবির চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি হাসতে হাসতে বললেন, জানিস, ছোটোবেলা পশু-পাখিদের খুব ভালোবাসতাম। অনেকদিন পর্যন্ত একটা কাঠবিড়ালি ছিল আমার সাথে। তোর মা জানে। তো আজ সকালে বেলকনিতে বসে কফি আর কেক খাচ্ছিলাম। বিনু খালা কাজে আসেনি।
–কেন আসেনি?
–এমনিতেই বেচারির বয়স হয়েছে, তাছাড়া পাঁচদিন ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে গেছে।
–তোমার সাথে ঝগড়া করার এটাও একটা পয়েন্ট।
–ঠিক আছে, তার আগে গল্পটা শেষ করি। গ্রিলের ওপাশে অনেকগুলো বুলবুলি ডাকাডাকি করছিল। আমার কেন জানি মনে হলো ওরাই তো আমার প্রতিবেশী। ওরা কথা বলতে পারুক বা না পারুক, আমি খাচ্ছি আর ওদের সাথে গল্প করছি। হঠাৎ একটা কাঠবিড়ালি ডাল বেয়ে গ্রিলের উপর পড়ল লাফিয়ে। তারপর আমি অন্যরকম আনন্দ অনুভব করলাম। মনে হলো সেই কাঠবিড়ালির বংশধর হবে হয়তো।
বাবার কথা শুনে সুরেখা ছোটোদের মতো খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, আব্বু তুমি বাচ্চাদের মতো কী যে বলো না। কবি সফিক বললেন, আমার তাই মনে হলো। একদিন খুব ভালোবেসেছিলাম তো! থাক সে কথা, আমি পিরিচটা এগিয়ে দিলাম টেবিলটার শেষ দিকে। কাঠবিড়ালিটাও বসল এসে টেবিলে। লেজটা পিঠের উপর তুলে দুহাতে কেক ধরে খেতে শুরু করল।
–তারপর?
–তারপর; পিরিচে একটু কফি ঢেলে এগিয়ে দিলাম।
–খেয়েছিল?
–শুধু একবার মুখ দিয়েই চলে গেল।
ঝুলে পড়া ওড়নাটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে সুরেখা তাকালো বাবার দিকে। কবি বললেন, কিছু বলবি? বল না– যা তোর মন চায়। খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।
–জানো আব্বু, যেদিন থেকে এই মার্জিত ভদ্র পোশাক পরতে শুরু করেছি, তারপর থেকেই মনের সব অস্থিরতা কেটে গেল। তুমি খুশি হবে বলে এভাবে তোমার সামনে আসব আসব করে...
–এসে খুব ভালো করেছিস। আরো আগে এলি না কেন?
–তুমি খুশি হয়েছ আব্বু?
–আয়নায় দাঁড়িয়ে দেখেছিস? কী এক পবিত্র আলো ভরে আছে তোর চারপাশ। ঝগড়া করবি বলেছিলি না? এখনি শুরু করবি নাকি...
–আব্বু এই ফ্ল্যাট তুমি ভাড়া দিয়ে দাও।
–তারপর?
–তুমি আর একা থাকবে না। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকব।
–তোর মায়ের বাড়িতে?
–মায়ের হলেও সে-তো আমাদের সবারই বাড়ি। আমাদের নিয়েই তো মায়ের পরিচয়।
–এমন কথা কি তোর মা বলেছে?
–জানো, মা আর আগের মতো নেই। সময় পেলেই তোমার বই নিয়ে খুব মন দিয়ে পড়ে। কথাটা শুনে কবি সফিকের মনটা সহসা যেন প্রীতিময় হয়ে উঠল। যে অহংকারী মহিলা কোনোদিন আমার কোনো একটি বই-এর একটি লাইনও পড়ে দেখেনি, সে আজ...। মনটা কেমন বিচলিত হয়ে উঠল। কবি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তুই সত্যি বলছিস? সুরেখা হাসতে হাসতে বলল, হ্যাঁ আব্বু।
–কোন বইগুলো, কবিতা না উপন্যাস?
–মনে হচ্ছে তুমি এখনি মায়ের কাছে যেতে চাও!
–না রে, আমি আর ঘরজামাই হতে চাই না; বরং তুই তোর মাকে নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে চলে আয়।
গল্পে গল্পে সূর্য ডুবল। গোধূলি রাঙা আলোয় পশ্চিমের বেলকনি হাসছে। কবি তার মেয়েকে বলল, নামাজ পড়বি? সুরেখা বলল, এমন প্রশান্তি থেকে আর কখনো দূরে থাকব না আব্বু।
–তোর মা!
–আমার কাছে একটু একটু করে শিখছে।
–আয়, নামাজ পড়ে একটু দোকানে যাব।
–লাগবে না। মনে করো আমিই তোমার বিনু খালা।
একথা বলেই সুরেখা বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো হেসে গড়িয়ে পড়ল। কবি দুহাতে মেয়ের মুখটা তুলে ধরে বললেন, খালা হতে যাবি কোন দুখে, তুইতো আমার মা।
কবি দোকান থেকে ফিরে এলেন। হাতে বেশ বড়ো একটা কেক আর রুহ্ আফজার বোতল। সুরেখা এতক্ষণে টেবিলে নাস্তা সাজিয়ে পুবদিকের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখল তার বাবা আসছে। দেখে মনে মনে হাসল সুরেখা। দরজা খুলে বলল, দোকান থেকে আমার জন্য কী এনেছ?
–এখন আর সিগারেট খাই না। তাই এক খিলি পান নিয়ে এলাম। এই রুহ্ আফজার বোতলটা তুই নিয়ে যাবি।
টেবিলে প্লেট ভরা লুচি, ডিম ভাজি আর আলুপুরি দেখে অন্যরকম হেসে বাবা বললেন, আমার সেই ছোট্ট মেয়েটা কত বড়ো হয়ে গেছে। ভাবতে আমার অবাক লাগছে। জানিস, আমি ছোটোবেলা যখন কোথাও যাব বলে তাড়াহুড়া করতাম, তখন তোর দাদিও ঠিক এমনি করে অল্প সময়ে কত কিছু তৈরি করে সামনে দিতেন। সুরেখা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, সব মায়েরাই তাই করে।
নাস্তা শেষ করে কফিতে চুমুক দিয়ে সফিক সাহেব বললেন, রেজাল্টের পর কি করবি কিছু ভেবেছিস?
–তুমি কী করে জানলে আমি ফাইনাল দিয়েছি?
–পত্রিকায় চাকরি করবি? দেশের কথা দশের কথা লিখবি। তাছাড়া নিজের মনের ভালো চিন্তাগুলো দশজনের ভালোর জন্য সহজেই ছড়িয়ে দিতে পারবি সারাদেশে।
–অনেকেই আবার পছন্দ করবে না।
–অনেকে মানে? তোর মা?
–না। তোমাকে আরেক দিন বলব।
সহসা সুরেখার মুখটা লজ্জায় কেমন লাল হয়ে গেল। বাবা বললেন, লজ্জা পাচ্ছিস কেন। ছেলেটি দেখতে কেমন, খুব সুন্দর? সুরেখা টেবিল গুছাতে গুছাতে বলল, বললাম তো পরে বলব। কবি বললেন, তোকে আজই বলতে হবে। আমার তো ছেলে নেই, তোর সাথে বিয়ে হলে সেও তো আমার ছেলেই হবে। তোর মতো সেও আমাকে আব্বু বলবে।
–তুমি এমন ছেলেমানুষী করো না। ও বাংলাদেশ ব্যাংকে আছে।
–খুব বড়ো লোকের ছেলে বুঝি।
–না, খুব সাধারণ ভদ্রঘরের ছেলে। নামাজি।
–এখন যারা শিক্ষিত এবং ভদ্র বলে দাবি করে, তাদের পোশাক আর চলাফেরার সাথে আমার মেয়েটার মিল নেই। তো...
–ও ওসব পছন্দ করে না।
–ছেলেটার নাম কী রে?
–সে তোমার বাবা। তবে নামের আগে 'কাজী' আছে। বলেই সুরেখা হেসে ফেলল। বাবা বললেন, তার অর্থ কাজী হায়াৎ। তোর মাকে বলেছিস? সুরেখা হেসে বলল, এবার তুমি থামবে? আমি রওনা হবো। মা হয়তো চিন্তা করছে।
–যাবি কী রে, তুই যে ঝগড়া করতে চেয়েছিলি!
সুরেখা এর মধ্যে ব্যাগ গুছিয়ে বলল, আজ আর সময় হবে না। কবি হাসতে হাসতে বললেন, আজ আর তোর গিয়ে কাজ নেই। মাকে ফোন করে দে। সারারাত গল্প হবে আবার ঝগড়াও হবে। বলল বটে কিন্তু মেয়েকে আটকানো যাবে না বুঝেই তিনি আবার বললেন, ঠিক আছে আমি তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি। সুরেখা বাবার দিকে চেয়ে বলল, কত দূর?
–বাড়ি পর্যন্ত।
–তুমি গেলে তোমাকে কিন্তু আসতে দেব না।
–তুই বাসে যাবি তো, চল তোকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।
তখন রাত প্রায় আটটা বেজে গেছে। বাসে উঠতে গিয়ে সুরেখা ফিরে দাঁড়ালো। বাবার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বাচ্চাদের মতো কেঁদে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে একা রেখে যেতে ইচ্ছে করছে না আব্বু। কবি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আমি তো একাই থাকি। আমাকে নিয়ে ভাবিস না। যা, বাস দাঁড়িয়ে আছে। সুরেখা বাসে উঠল। বাবা বললেন, ঝগড়া করতে কবে আসবি?
সুরেখা বলল, সেদিন এসে কিন্তু তোমাকে ধরে নিয়ে যাব। বলেই হাসতে হাসতে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল সুরেখা। বাস চলতে শুরু করেছে। কবি চোখের পানি মুছে নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন বাসের দিকে।

প্রিয় স্বাধীনতা

মণিকাঞ্চন ঘোষ প্রজীৎ

এইমাত্র একটি পাখি
তার কোমল কণ্ঠে সুর তুলে গেয়ে গেল
বাতাসের সুর তার মন্দ লাগে না
পাখিটার কোমল দুটি আঁখি
কোনো এক ঠিকানা সে পেয়ে গেল
তাই হতাশার কোনো ছন্দ তার হৃদয়ে জাগে না।
পাখিটা স্বাধীনতা ভালোবাসে
ভালোবাসে বাংলার প্রতিটি ধূলিকণা
তাই সে দূরে গিয়েও ফিরে আসে
বেঁচে থাকে খেয়ে এই বাংলার শস্যদানা।
পাখিটার প্রিয় এই স্বাধীনতা
ডানা মেলে নীলাকাশে উড়তে চায়
ভেঙে দিয়ে বন্দি খাঁচা, পরাধীনতা
আপন স্বাধীনতায় ঘুরতে চায়।
পূর্ণ হোক পাখিটার স্বাধীনতার সাধ
খাঁচাগুলো খুলে দাও ঘুচে যাক অবসাদ।

প্রথম প্রেমে বৈশাখ

খাইরুল ইসলাম তাজ

যা কিছু প্রথম, তা যেন বৈশাখের মাতম
বৈশাখ আর অনেক প্রথম- দু'জন দু'জনার।
বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস,
বৈশাখ এদেশে ষড় ঋতুর প্রথম মাস,
বৈশাখের প্রথম দিনে বাংলা বর্ষ শুরু;
বৈশাখেই নব বছরের গোড়াপত্তন-
বৈশাখের প্রথম দিন পুরোটাই হালখাতার।
বৈশাখে নামে উৎসবের ঢল, মেলা গ্রামে গ্রামে
বৈশাখের প্রথম প্রহর, পল্লি মানুষের শক্তিবহর;
বৈশাখের প্রথম দান, কালবৈশাখি ঝড়ের গান
প্রথম প্রহরে বটমূলে, বৈশাখ আয়োজনের টান।
বৈশাখের প্রথম প্রীতি, দোয়েল- কোয়েলের গীতি
বৈশাখ মাসেই প্রথম আসে বিগত বছরের স্মৃতি।
বৈশাখে বেরোয় নতুন সনের প্রথম দিনপঞ্জিকা,
বৈশাখে আসমানি গগন, রং পালটায় আচমকা।
কৃষ্ণচূড়ার রক্ত আবীরে খুঁজি বৈশাখের সুখছন্দ
ভোরের মিষ্টি হাওয়া বৈশাখে, আসে মৃদুমন্দ।

ঝরা ফুলের গান

রুহুল গনি জ্যোতি

শব্দগুলো ঝরা ফুল মনের উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে
অযথাই গন্ধে মাতায় পাগল করে রাখে এ এক নেশার ঘোর
মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাই সারাদিন শব্দের মালা গাঁথি কেবলই শব্দ সাজাই।
পৃথিবীর সব সুখ আনন্দ-উল্লাস হাসি গানে মিছিলের মুখগুলো থেকে
উচ্ছ্বাসে ঝরে পড়ে কখনো বা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে কখনো প্রচণ্ড আবেগে
ঝরে পড়ে শব্দমালা প্রত্যয়ের দৃঢ়তায়
বজ্রমুষ্ঠিতে ধরে ব্যানার, ফেস্টুন স্লোগান জুড়ে শব্দের মিছিলে নামে
এক একটা শব্দের বিস্ফোরণ যেন পৃথিবী কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।
শব্দগুলো যেন বারুদের গান থামতে জানে না কিছুতেই কেবলই আগুন ঝরায়
কেবলই পোড়াতে চায় ঘরবাড়ি সমাজ-সংসার সামনে যা কিছু পায়।
একেকটি শব্দ যেন একেকটি চিন্তার ফুল
স্বপ্নের প্রজাপতি বাহারি রঙের মেলা
কখনো বা উড়ন্ত মেঘমালা মনের আকাশ জুড়ে একঝাঁক মুক্ত বলাকার মতো
পলকে হারিয়ে যায় আকাশের অনন্ত অসীম নীলে, সুদূর সীমাহীনতায়
কখনো বা ফিরে ফিরে আসে
শব্দগুলো যেন প্রিয়ার ঘুঙুর মৃদু লয়ে বাজতে থাকে
মনের উঠোন জুড়ে থামে তার আসা-যাওয়া কেবলই কানে বাজে
কেবলই হারিয়ে যায় বারে বারে ফিরে ফিরে আসে
বুকের গভীরে তার একান্তই একাকী গোপনে।

ফেলে আসা দিনগুলো

মিয়াজান কবীর

মনে পড়ে আজও বৈশাখি ঝড়ে
আম কুড়ানো সুখকর সেই স্মৃতি,
জৈষ্ঠ্যের পাকা জামে রঙিন করেছি মুখ।
আষাঢ়ের জোয়ারে ভেলায় ভেসেছি
ধলেশ্বরীর উথালপাতাল ঢেউয়ের দোলায়।
ভাদ্রর ভ্যাপসা গরমে ঝাঁপ দিয়েছি গ্রামের জলে
মেতে উঠেছি আইল ডুব মেলায়।
আশ্বিনে গাস্যি উৎসবে হলুদ গায়ে মেখে স্নান করেছি স্বচ্ছ জলে;
তালের আঁটি খেয়েছি খুব মজা করে।
কার্তিক এলে হাতে বেঁধেছি মাদুলি ওলা ওঠার ভয়ে।
অঘ্রানে ধান কুড়িয়েছি সোনাবরণ ফসলের মাঠে মাঠে।
পৌষের শীতের সকালে
ভাপা পিঠে নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি ভাই-বোনে।
ফাগুনের ফুল ফোটা বসন্ত দিনে
শুনেছি পাখির কিচিরমিচির কাকলি।
চৈত্রের চৈতালির সমারোহে কিশোর মন
নাড়ার আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খেয়েছি মটরশুঁটি।
ফেলে আসা সেই মধুময় শৈশবের স্বপ্নঝরা স্মৃতি
আজও ডাকে আমায় হাতছানি দিয়ে
আজও ডাকে ফেলে আসা দিনগুলো।

নতুন দিনের চাঁদ

নাফ্‌হাতুল জান্নাত

কত কষ্ট কবিতার পাঁজরে, মাতাল সমীরণ
বোঝে কি সে ভাষা? বাঁশঝাড়ের সবুজ পাতাগুলো
একে একে খসে যায় সময়ের আর্তনাদে,
বিমর্ষ ডুমুর গাছে অন্ধকার
শুধুই অ ন্ধ কা র, অ ন্ধ কা র...
বুকের গভীরে কষ্ট বৃক্ষ
অক্টোপাস হয়ে জড়িয়ে ধরে,
বাঁকা চাঁদ বোঝে না কৃষ্ণের লুকিয়ে রাখা রক্তক্ষরণ
তারপরও কোথায় যেন বিষকাঁটালির ঝোপের ধারে
একটা শিয়াল ডেকে ওঠে,
কষ্ট শুধু দগ্ধ করে ভোরের আলো বেড়ার ফাঁকে
হাতছানি দেয় অন্য স্বরে
বুকের পাঁজর যায় ভেঙে যায় শীতের রাতের অহমিকায়,
তারপরও তো চাঁদ ওঠে, রাতের পরে আরেক
নতুন দিনের আমন্ত্রণে লুকোয় মেঘের শার্শি ধরে।

তরুলতার বন

জাকির হাসান

তরুলতার বন নেয় কেড়ে মন
তাজা-তাজা, সবুজ-সবুজ, কাঁচা-কাঁচা, অবুঝ-অবুঝ
লতাপাতার বন,
পাখপাখালির ডাকাডাকি
আজব ভাষায় হাঁকাহাঁকি, শিউরে ওঠে মন।
ছোট্ট ঝিল তাহার ধারে, রৌদ্র আলো ঝিলিক মারে
মৌমাছি আর কীট-পোকারা, পাখির খাবার হয় বোকারা
মাছরাঙা সব চুপ
মাছরাঙাদের ভীষণ চমক, কেউ শোনে না মাছের ধমক
ঝিলের পাড়ে বেতুল গাছ, গাছের ছায়ে ভাসে মাছ
যেই না ঝিলে ভাসে মাছ, মাছরাঙা দেয় ডুব।
রাত গড়াতেই জোনাক জ্বলা, মিটিমিটি আলোর চলা
ঝিঁঝি পোকা ব্যস্ত হয়ে ডাকে, ডাহুক ছানা খুঁজে ফেরে মাকে
সর্প-বেজির খেলা সেকি! ধস্ড়াধস্ড়ি হঠাৎ দেখি
রেলগাড়ির মতোই ছুটে চলা, কালো আর লাল পিঁপড়ের মেলা।
বৃষ্টি হলে দৃষ্টি কাড়ে, জলের ফোঁটা পাতা নাড়ে
সতেজ করে তরুলতার বন, সারাক্ষণ ছুঁয়ে যায় এই মন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০১৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বর্ণদ্বীপ জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপকে 'বিরাট সম্ভাবনা' উল্লেখ করে বলেন, পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিলে এই দ্বীপ জাতীয় অর্থনীতিতে বড়ো ধরনের অবদান রাখবে। তাছাড়া আয়তনের দিক দিয়ে প্রায় সিঙ্গাপুরের সমান এবং সমুদ্রের কাছে এই দ্বীপটিকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারলে ভবিষ্যতে এটি বাংলাদেশের জন্য আরেক সিঙ্গাপুর হয়ে যেতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। ২৪শে মার্চ স্বর্ণদ্বীপ পরিদর্শনকালে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। এরপর তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এবং সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে নির্মাণাধীন ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের সবার। তাই তিনি নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটানোর আহ্বান জানান। ১৯শে মার্চ গাজীপুরের শহিদ বরকত স্টেডিয়ামে ১৯৭১ সালের ১৯শে মার্চ স্বাধীনতার প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর ও শহিদদের স্মরণে আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা ও আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, খণ্ডিত ইতিহাস কোনো জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের ২৬শে মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন, সংগ্রামই একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মুক্তিযুদ্ধে কার কী অবদান তা আমাদের পরিপূর্ণভাবে জানতে হবে।

কারাবন্দিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ কারাবন্দিদের সংশোধনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কারা কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। ২০শে মার্চ কারা সপ্তাহ ২০১৮ উপলক্ষে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'পৃথিবীতে কেউ অপরাধী হিসেবে জন্মায় না। বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ও প্রতিকূল পরিবেশ তাদের অপরাধী বানায়। সেই কারণে কারা কর্তৃপক্ষকে তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে যাতে তাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ও পরবর্তীতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।'

সেনাবাহিনী দেশের আস্থা ও গর্বের প্রতীক

রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, জাতির পিতার হাতে গড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের আস্থা ও গর্বের প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সশস্ত্রবাহিনী আমাদের

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৪শে মার্চ ২০১৮ নোয়াখালীর স্বর্ণদ্বীপে ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের নামফলক উন্মোচন করেন–পিআইডি

অহংকার। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনীতে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার কিছু যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২৮শে মার্চ নীলফামারীর সৈয়দপুর সেনানিবাসে বাংলাদেশ আর্মি ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স কোরের পঞ্চম কোর পুনর্মিলনী ২০১৮ উপলক্ষে ভাষণকালে এসব কথা বলেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফোর্সেস গোল ২০৩০ চূড়ান্তকরণ ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। ফোর্সেস গোল ২০৩০-এর সার্বিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি পরিপূর্ণ, আধুনিক, কার্যকর ও যুগোপযোগী বাহিনীতে রূপান্তরিত হবে।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০১৮ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কৃষি গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার তাগিদ দেন। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষির ব্যবহারিক শিক্ষাটা যেন থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকে অন্তত নিজের ঘরেও যদি বাগান করেন বা নিজের যেসব জমি আছে সেখানে বাগান করেন অথবা অব্যবহৃত যেসব জমি পড়ে আছে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সেসব যদি চাষ করা যায় তাহলে আমাদের খাদ্যের অভাবতো হবেই না, উপরন্তু আমরা বিশ্বের অনেক দেশের মানুষকে খাদ্য সাহায্য দিতে পারব। পরে প্রধানমন্ত্রী ৩২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে পদক ও চেক প্রদান করেন।

৪৮ প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৫২টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা মার্চ খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সুইচ টিপে ৪৮টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৫২টি নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে তিনি দুপুরে আইইবি খুলনা সেন্টারে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর ৫৮তম কনভেনশনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে এবং বিকল্প জ্বালানি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, স্বল্প ব্যয়ে বাড়িঘর নির্মাণের কৌশল ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে এগিয়ে আসতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে টেকসই করার জন্য পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো, ভূমিকম্প ও দুর্যোগসহিষ্ণু প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সন্তানদের মুক্ত রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্তানদের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখতে এবং এ বিষয়ে তাদের সচেতন করে গড়ে তুলতে অভিভাবক-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। ৪ঠা মার্চ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধু ফেলোলিপ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং গবেষণা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ আহ্বান জানান। শিক্ষার্থীরা কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে, কী করছে তার প্রতি লক্ষ রাখারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের বিপুল সমুদ্র সম্পদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী ১১৬ জনকে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, ২৩৫৮ জনকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং ১৪১টি প্রকল্পকে গবেষণা অনুদান দেন।

জাতীয় পাট দিবস ২০১৮ উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় পাট দিবস ২০১৮' উপলক্ষে ৩ দিনব্যাপী পাটপণ্য মেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী পাট খাতের যান্ত্রিকীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং দেশের সরকারি খাতের পাটকলগুলোকে লাভজনক করে তুলতে আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশ দেন। তিনি পাট উৎপাদন, পাট রপ্তানি, পাট প্রক্রিয়াজাতকরণসহ বিভিন্ন খাতে যারা পুরস্কার পেয়েছেন তাদের অভিনন্দন জানান।

কন্যাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা দানের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নারীদের আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদা নিয়ে চলে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। মেয়ের বিয়ের জন্য বাবা-মাকে তাড়াহুড়ো না করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো শিক্ষা প্রদানে মনোনিবেশ করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি নারী উন্নয়নে তাঁর সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি নারীর উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫ জন জয়িতার হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন।

বাংলাদেশ যুব গেমসের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রথম বাংলাদেশ যুব গেমসের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে কার্যকরভাবে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং যুব সমাজকে মাদকসহ বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এ লক্ষ্যে তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি যুবসমাজকে খেলাধুলা করার আহ্বান জানান। তিনি দেশব্যাপী আয়োজিত এই গেমসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুপ্ত প্রতিভা উদ্ভাসিত হবে এবং খেলাধুলার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গাপুর সফর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই মার্চ সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে চারদিনের সরকারি সফরে সিঙ্গাপুর যান। সিঙ্গাপুরের পরিবেশ ও পানি সম্পদ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র প্রতিমন্ত্রী ড. আমি খোর এবং সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. মোস্তাফিজুর রহমান বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। ১২ই মার্চ প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি হালিমা ইয়াকুবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী লি মিয়েন লুংয়ের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে তিনি রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে মিয়ানমারকে বোঝানোর জন্য সিঙ্গাপুরের প্রতি আহ্বান জানান। বৈঠক শেষে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্মানে দেওয়া ভোজসভায় অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য সিঙ্গাপুরে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ প্রদানের জন্য সিঙ্গাপুর সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের ব্যস্ততম বাণিজ্য বন্দর পোর্ট অব সিঙ্গাপুর পরিদর্শন করেন। ১৩ই মার্চ সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত বোটানিক গার্ডেনসের ন্যাশনাল অর্কিড গার্ডেনে তাঁর নামে নামকরণ করা একটি অর্কিডের উদ্‌বোধন করেন। তিনি বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর বিজনেস ফোরামের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ীদের অংশীদার হতে আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগকারীদের জন্য চট্টগ্রামে ৫০০ একর জমি দেওয়ারও প্রস্তাব দেন।

বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে মার্চ চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নেভাল অ্যাকাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স-এর উদ্‌বোধন করেন। এটি দেশের নৌবাহিনীর জন্য সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রথম প্রশিক্ষণ একাডেমিক কমপ্লেক্স। এর উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দক্ষতার সাথে বিপুল সমুদ্র সম্পদ আহরণের মাধ্যমে কাজে লাগানোর জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে অর্পিত দায়িত্ব সফল ও নিরাপদভাবে পালন করতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রী বিএন ডকইয়ার্ডকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেন এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

উন্নয়ন, সাফল্য ও অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণে তাঁকে দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদপত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী এই উন্নয়ন, সাফল্য ও অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এই অর্জন যেন কোনোভাবেই হারিয়ে না যায়। আমরা কেন পিছিয়ে থাকব'।

বিজয়ী জাতি হিসেবে আত্মমর্যাদা নিয়ে চলার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে 'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮' উপলক্ষে আয়োজিত শিশু-কিশোর সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী শিশু-কিশোরদের দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ নিয়ে বেড়ে ওঠে বিজয়ী জাতি হিসেবে বিশ্বে আত্মমর্যাদা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই মার্চ ২০১৮ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বইমেলা উদ্‌বোধন শেষে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন–পিআইডি

নিয়ে চলার আহ্বান জানান। ছেলেমেয়েরা যেন কোনোভাবে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ এবং মাদকে আসক্ত না হয় সে বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক এবং মসজিদের ইমামদের লক্ষ রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বৃষ্টি ও বন্যার পানি সংরক্ষণের তাগিদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের নামে জলাধার দখল করে ভরাট বন্ধের তাগিদ দেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নও বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান। তিনি নিজস্ব পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বৃষ্টি ও বন্যার পানি সংরক্ষণের কথা উল্লেখ করেন।

বিশ্বকাপ খেলবে খুদে ফুটবলাররা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় টুর্নামেন্ট'-এ বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের এখনকার খুদে ফুটবলাররাই আগামীতে দেশকে বিশ্বকাপে নিয়ে যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি দুই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী সব খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

একুশে পদকপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালকদের সংবর্ধনা

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের জহির রায়হান মিলনায়তনে ৮ই মার্চ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি আয়োজিত 'একুশে পদকপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালকদের সংবর্ধনা' সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু একুশে পদকপ্রাপ্ত একুশ জন চলচ্চিত্র পরিচালক এবং প্রয়াত

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২৬শে মার্চ ২০১৮ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন–পিআইডি

পরিচালকদের প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

এ সময় তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকারের ছাতার নিচে চলচ্চিত্র-শিল্প-সাহিত্য বিকশিত হচ্ছে। সমগ্র চলচ্চিত্র অঙ্গন মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার পক্ষে। এখানে রাজাকার ও জঙ্গিদের কোনো স্থান নেই।

তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে একাগ্রভাবে কাজ করছে। সাভারের কবিরপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম সিটি নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ ও এফডিসি সংলগ্ন স্থানে চলচ্চিত্র কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। নির্মিত হয়েছে আধুনিক ফিল্ম আর্কাইভ।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা করেননি

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য 'আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইবুনালস) আইন ১৯৭৩' প্রণয়ন করেছিলেন। সেই আইনের আওতায় তখন অনেকের বিচার সম্পন্ন হয়েছিল। যারা মনে করেন যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা করে গেছেন বঙ্গবন্ধু– সেটি ভুল এবং ভ্রান্ত তথ্য।

২৫শে মার্চ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে এসব কথা তিনি বলেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি আরো বলেন, ১৯৭১ সালে যারা ঘরবাড়ি, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও হত্যার মধ্যে লিপ্ত ছিল, তারা কখনোই সাধারণ ক্ষমার আওতাভুক্ত ছিল না। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ জাকির হোসেন। এরপর তথ্য অধিদফতর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্থিরচিত্র প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম।

স্বাধীনতার পথে থাকতে সকলের প্রতি আহ্বান

স্বাধীনতার পথে থাকতে জঙ্গিদের পরাজিত ও বিদায় করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। ২৬শে মার্চ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতার পক্ষে থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সকল শহিদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, গণহত্যা দিবস, ৩০ লাখ শহিদ, সংবিধানের চার নীতি মানে তারাই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। সভায় নির্বাচনসহ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু রাখতে জঙ্গিদের ধ্বংস এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমতা ও রাজনীতির বাইরে রাখারও আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২৫শে মার্চ ২০১৮ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ও তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্থিরচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চ ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার। আলোচনা সভা শেষে তথ্য অধিদপ্তর ও ডিএফপি আয়োজিত স্থিরচিত্র প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তথ্যমন্ত্রী।

নতুন তথ্য সচিবের যোগদান

আবদুল মালেক ১৮ই মার্চ ২০১৮ তথ্য মন্ত্রণালয়ে নতুন তথ্য সচিব হিসেবে যোগদান করেন। তিনি পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে বিএসএস (অনার্স) সহ মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এছাড়া পরবর্তীতে তিনি আইনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ১৯৮৪ ব্যাচের কর্মকর্তা আবদুল মালেক ১৯৮৬ সালে সহকারী কমিশনার পদে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়ায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি মাঠ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বৈচিত্র্যময় কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তিনি কুমিল্লার জেলা প্রশাসক ও জেলা মেজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব-১ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব, এবং পরবর্তীতে সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব আবদুল মালেক বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৮ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে মার্চ ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৮' প্রদান করেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন– স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে মরহুম কাজী জাকির হাসান (মরণোত্তর), শহিদ বুদ্ধিজীবী এস এম এ রাশীদুল হাসান (মরণোত্তর), প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরী (মরণোত্তর), এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বীর-উত্তম, এসিএসসি (অব.), মরহুম এম আব্দুর রহিম (মরণোত্তর), প্রয়াত ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ওরফে মানিক চৌধুরী (মরণোত্তর), শহিদ লে. মো: আনোয়ারুল আজিম (মরণোত্তর), মরহুম হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (মরণোত্তর), শহিদ আমানুল্লাহ্ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (মরণোত্তর), শহিদ মতিউর রহমান মল্লিক (মরণোত্তর), শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক (মরণোত্তর) ও আমজাদুল হক, চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. এ. কে. এমডি আহসান আলী, সমাজসেবায় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান, সাহিত্যে সেলিনা হোসেন, খাদ্য নিরাপত্তায় ড. মোঃ আব্দুল মজিদ, সংস্কৃতিতে আসাদুজ্জামান নূর এবং কৃষি সাংবাদিকতায় শাইখ সিরাজ। পুরস্কার হিসেবে প্রত্যেককে একটি স্বর্ণপদক, একটি সম্মাননা পত্র ও চেক প্রদান করা হয়।

প্রতিবেদন: নাহিদা সুলতানা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

বিশ্ব শ্রবণ দিবস

৩রা মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব শ্রবণ দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ভবিষ্যৎকে শুনুন, সচেতন হোন'।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ

৬ই মার্চ: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সারাদেশে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৮' উদ্‌যাপিত হয়।

১৭ই মার্চ ২০১৮ টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৮তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

৭ই মার্চ: দেশজুড়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় জাতি ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ পালন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর বিশ্ব দালিলিক প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভ করায় এবার দিবসটি ভিন্ন মাত্রায় উদ্‌যাপিত হয়।

বিশ্ব কিডনি দিবস পালিত

৮ই মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব কিডনি দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'সুস্থ কিডনি সবল নারী, নারী শিক্ষায় নারীর মুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক মুক্তি'।

যুব গেমসের উদ্‌বোধন

১০ই মার্চ: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে যুব গেমসের জমকালো উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস

সারাদেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস'। দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'জানবে বিশ্ব জানবে দেশ, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত বাংলাদেশ'।

বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস

১৫ই মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ডিজিটাল বাজার ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ'।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত

১৭ই মার্চ: বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার দৃঢ়প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে সারাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৯তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। একই সঙ্গে জাতি দিনটিকে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবেও উদ্‌যাপন করে।

জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা অনুমোদন

১৯শে মার্চ: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে নতুন 'জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতিমালা ২০১৮'-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে।

ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে পালিত

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'ওয়ার্ল্ড ওরাল হেলথ ডে'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'আহ বলুন'।

বিশ্ব বন দিবস পালিত

২১শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব বন দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'সবুজ বন, সমৃদ্ধ নগর'।

বিশ্ব পানি দিবস

২২শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব পানি দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'পানির জন্য প্রকৃতি'। বাংলাদেশে দিবসটি এবার ২৭শে মার্চ পালিত হয়।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

২৩শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের উত্তরণে তাঁকে প্রদত্ত সংবর্ধনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব আবহাওয়া দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ওয়েদার-রেডি, ক্লাইমেট-স্মার্ট'।

গণহত্যা দিবস

২৫শে মার্চ: বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একাত্তরের ২৫শে মার্চের পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ স্মরণে পালন করে 'জাতীয় গণহত্যা দিবস'। এদিন রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট সারাদেশে বাতি নিভিয়ে (ব্ল্যাক আউট) গণহত্যা দিবস পালন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

২৬শে মার্চ: সমৃদ্ধির পথে উত্তরণে নব আনন্দে জেগে ওঠার উচ্ছ্বাস আর বিনম্র শ্রদ্ধায় উদ্‌যাপিত হয় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস।

বিশ্ব নাট্য দিবস

২৭শে মার্চ: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব নাট্য দিবস'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

(পিপিপি) এবং এয়ার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কনফিডেন্সিয়াল সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে।

সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ইস্তানায় দুদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং-এর উপস্থিতিতে স্মারক দুটি স্বাক্ষরিত হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন সচিব এসএম গোলাম ফারুক এবং সিঙ্গাপুরের পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব তান গাই সেন উভয় দেশের এয়ার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত কনফিডেন্সিয়াল সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন।

প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর সিইও সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিন এবং সিঙ্গাপুরের আন্তর্জাতিক এন্টারপ্রাইজের সহকারী সিইও তান সুন কিম উভয় দেশের পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) বিষয়ক সমঝোতা স্মারকটিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে মার্চ ২০১৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে শিশু-কিশোর সমাবেশ ও কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন–পিআইডি

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নয়নশীল দেশের কাতারে বাংলাদেশ

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) বাংলাদেশকে এ স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৭ই মার্চ সিপিডি বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতিপত্র প্রদান করে। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশের পথে বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো। তিন বছর পর পর এই কমিটির পর্যালোচনা সভা হয়। অর্থনীতিবিদগণ বলছেন, বাংলাদেশের সামনে এখনো বহুমুখী চ্যালেঞ্জ। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশের চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করবে বাংলাদেশ।

২০২১ সালে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি দ্বিতীয়বার পর্যালোচনা করবে সিপিডি। ২০২৪ সালে এ অর্জনের অনুমোদন দেবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। অগ্রগতির বড়ো ধরনের ব্যত্যয় না ঘটলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে স্থায়ীভাবে পৌঁছাবে।

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর দুটি সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুর ১২ই মার্চ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ

চট্টগ্রাম ওয়াসা পাচ্ছে গ্লোবাল ট্রেড লিডার্সের পুরস্কার

চট্টগ্রাম ওয়াসা গ্লোবাল ট্রেড লিডার্সের আন্তর্জাতিক নির্মাণ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বিশ্বের ৯৫টি দেশ নিয়ে গঠিত ব্যবসায়ীদের এ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা সাড়ে ৭ হাজার। ১৫ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে প্রেরিত সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি রিকার্ডো রসো লিওপিজ স্বাক্ষরিত এক পত্রে এ পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্য অবহিত করা হয়েছে। সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ করায় গ্লোবাল ট্রেড লিডার্স ২০১৮ সালের জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসাকে নির্বাচিত করেছে। স্পেনের মাদ্রিদ শহরে ১৪ই মে এ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে। বিশ্বের ৯৫টি শহরের মধ্যে চট্টগ্রাম ওয়াসা ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষকে এ আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করেছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি চাকরিতে কওমি আলেম নিয়োগ

কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির গেজেট প্রকাশের পর ৫ই মার্চ ২০১৮ তারিখে সরকারি চাকরিতে এক হাজার কওমি আলেম যোগ দিয়েছে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম একসাথে এত আলেম

সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (ষষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পের দারুল আরকাম ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় কওমি নেসাবের শিক্ষক হিসেবে তারা যোগ দেন। দ্বীনি শিক্ষাকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে সরকার এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্রদের মূল্যায়নও এই নিয়োগের লক্ষ্য। তিনটি পরীক্ষার মাধ্যমে এসব আলেম নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বন্দির জন্য বালিশ ও মশারি

বর্তমান সরকার কারাগারের সাধারণ বন্দিদের জন্য বালিশ ও মশারি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কারাগারে ঢোকার সময় প্রত্যেক বন্দি পাবে একটি করে শিমুল তুলার বালিশ, একটি মশারি ও দুটি বালিশের কভার। আগে দেওয়া হতো তিনটি কম্বল, একটি থালা ও একটি বাটি। এখন যোগ হলো বালিশ ও মশারি। তবে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দিরা আগে থেকেই এগুলো পেত। কারাগার শুধু শাস্তির জায়গা নয়, বন্দিকে সংশোধনাগার হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইলিশের স্যুপ বাজারে

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২০শে মার্চ ২০১৮ তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে 'বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করায় ঐতিহাসিক সাফল্য জাতীয় পর্যায়ে উদ্‌যাপন' উপলক্ষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তৃতা করেন। প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার এসময় উপস্থিত

শুধু ভাত বা খিচুরির সঙ্গে ইলিশ নয় এখন থেকে আমরা ইলিশের স্যুপও খেতে পারব। মৎস্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। বাংলাদেশ আজ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৬–১৭ অর্থবছরের মৎস্য উৎপাদনের ১২ শতাংশই ইলিশ। শিশুরা যেন এই মাছ কাটামুক্তভাবে খেতে পারে এবং অফ সিজনেও যাতে এই মাছ খাওয়া যায় সেজন্য ইলিশের স্যুপ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি বাজারজাত করছে ভার্গো ফিস অ্যান্ড এগ্রো প্রসেস লিমিটেড। পরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বাজারে আনতে পারবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দক্ষ নেতৃত্ব, মানবিকতা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকার কারণে জরিপের ভিত্তিতে এই স্বীকৃতি দিয়েছে সিঙ্গাপুরভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য স্ট্যাটিসটিকস ইন্টারন্যাশনাল। ১৯শে মার্চ মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই স্বীকৃতির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পড়ে শোনান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে এজন্য অভিনন্দন জানানো হয়। জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তাঁর যা কিছু অর্জন, সব কিছুই দেশের জনগণের জন্য।

২০১৭ সালে বিশ্ব গণমাধ্যমে উপস্থিতির ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করে সিঙ্গাপুরভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান দ্য স্ট্যাটিসটিকস ইন্টারন্যাশনাল। জরিপে বিশ্বের দ্বিতীয় সেরা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উঠে আসে শেখ হাসিনার নাম।

উল্লেখ্য, তিনবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে জমা হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক স্বীকৃতি আর পুরস্কার পেয়েছেন। এবার মিললো আরেকটি স্বীকৃতি।

পালিত হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস

২২শে মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সামনে থেকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এতে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই মার্চ ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নারীর উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন–পিআইডি

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে ৮ই মার্চ পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জাতিসংঘ এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'প্রগতিকে দাও গতি'।

আর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তাঁরা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্মজীবনধারা'।

সকাল ১০টায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। এরপরই সারাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শুরু হয় নানা কর্মসূচি। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আলাদা আলাদা বাণীতে বিশ্বের সব নারীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

নয় বছরে ৮০ শতাংশ নারী পুলিশ নিয়োগ

দেশে এ পর্যন্ত নিয়োগ পাওয়া নারী পুলিশের ৮০ শতাংশ নিয়োগ পেয়েছে গত নয় বছরে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পুলিশের ১১ হাজার ৭৬৭ জন নারী সদস্যের মধ্যে ৯ হাজার ২৪৭ জন নিয়োগ পেয়েছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের দুই মেয়াদে। বর্তমানে পুলিশের সদস্য সংখ্যা ১ লাখ ৯৮ হাজার ৬৫৩ জন। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) সূত্রে এ তথ্য পাওয়া যায়।

নারী উপ-উপাচার্য পেল বিএসএমএমইউ

প্রথম নারী উপ-উপাচার্য হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক সাহানা আখতার রহমান। ৬ই মার্চ রাষ্ট্রপতি ও বিএসএমএমইউ'র আচার্য মোঃ আবদুল হামিদ উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) পদে এ নিয়োগ দেন।

অধ্যাপক সাহানা আখতার রহমান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৯০ সালে এফসিপিএস (শিশু) এবং ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্য থেকে মেডিক্যাল এডুকেশনে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

১১ নারী ক্রীড়াবিদকে সম্মাননা প্রদান

সাঁতার, ফুটবল, গলফ্, শুটিংসহ খেলাধুলার জগতের ১১ জন নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। ৬ই মার্চ রাজধানীর বসুন্ধরার ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি মিলনায়তনে অ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আয়োজন করে এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের। যারা সম্মাননা পেলেন– জাতীয় কাবাডি দলনেতা শাহনাজ পারভীন, জাতীয় ক্রিকেট দলনেতা রুমানা আহমেদ, জাতীয় অনূর্ধ্ব ১৯ ফুটবল দলনেতা মারিয়া মান্দা, ভারোত্তোলক মাবিয়া আক্তার, শুটার উম্মে জাকিয়া সুলতানা, অ্যাথলেট শিরীন আক্তার, সাঁতারু সোনিয়া আক্তার, টেবিল টেনিসে সোনাম সুলতানা, জাতীয় বাস্কেট বল দলনেতা আমির মৃধা, গলফার সামাউন আনজুম এবং ঘোড়সওয়ার তাসনিমা আক্তার।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে তরুণদের এগিয়ে আসতে হবে। যারা ইভটিজিং ও নারী নির্যাতন করে তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। বরং সমাজ তাদেরকে ঘৃণা করে। যারা ইভটিজিং এবং নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করে তারা সমাজের হিরো। মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অডিটোরিয়ামে সেন্টার ফর ম্যান অ্যান্ড মাসকিউলাই নাইটিজ স্টাডিজ (সিএমএমএস) আয়োজিত 'ইয়ুথ এডভোকেসি ফোরাম অন প্রিভেনন্টিং ভায়োলেন্স অ্যাগেইনেস্ট উইমেন অ্যান্ড গার্ল' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন। তিনি ভিলেন না হয়ে হিরো হওয়ার জন্য তরুণদের আহ্বান জানান।

সৌদি আরবে প্রথম নারী উপমন্ত্রী

সম্প্রতি সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো একজন নারীকে উপমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁর নাম তামাদির বিনতে ইউসেফ আল-রাম্মাহ। সম্প্রতি দেশটির বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ তাঁকে শ্রম ও সামাজিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে তামাদির সমাজকল্যাণ ও পরিবার সংস্থারও দেখভাল করবেন।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

কারিগরি শিক্ষা টেকসই উন্নয়নের মূল হাতিয়ার

কারিগরি শিক্ষাই হবে দেশের টেকসই উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। কারিগরি শিক্ষাই কেবল পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে। চলমান বিশ্বের উপযোগী করে এজন্য কারিগরি শিক্ষাকে ঢেলে

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৪ই মার্চ ২০১৮ দক্ষিণখানে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সাজাতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৮ই মার্চ ঢাকায় এক হোটেলে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্কিলস অ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট আয়োজিত দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী 'Building Brand for skills of Bangladesh' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। মন্ত্রী কারিগরি শিক্ষায় এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সরকার কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিকায়নের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

নতুন প্রজন্মকে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ১৪ই মার্চ নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী নতুন প্রজন্মকে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। যাতে তারা বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে, ভালো মানুষ হতে পারে এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণে, সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোকে মানসম্পন্ন শিক্ষায় মনোযোগী হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই মার্চ বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিনের তৃতীয় এবং বাংলাদেশ ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং-এর প্রথম আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোকে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রেখে উপযুক্ত চিকিৎসক গড়ে তুলতে যথাযথ পাঠ্যক্রম অনুসরণের আহ্বান জানান। তিনি চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শিক্ষার মানের প্রতি নজর দেওয়ার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বই লেখার প্রতিও মনোনিবেশ করার এবং নতুন নতুন রোগের পাশাপাশি নতুন নতুন যে প্রযুক্তি আবিষ্কার হচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চিকিৎসক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ব্যাপক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় একাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। এবার দিবসটির প্রদিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'নারী ও বালিকাদের ক্ষমতায়ন, হোক না তারা অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন'। ২রা এপ্রিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অটিস্টিকদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ ও সমাজে তাদের মর্যাদাপূর্ণ জায়গা করে দেওয়ায় ভূমিকা রাখতে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অটিজমের বিষয়ে আমাদের সমাজকে আরো সচেতন হতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। অটিস্টিকরাও সমাজের অংশ। তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলো আমাদের বিকশিত হবার সুযোগ করে দিতে হবে। আর সমাজে তাদের একটা সুন্দর স্থান করে দিতে হবে।

সদ্য প্রয়াত বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংসহ অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির কথা প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন, যারা প্রতিবন্ধী হয়েও মানবতার কল্যাণে অসামান্য অবদান রেখেছেন এবং রাখছেন। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার উদাহরণ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি মনে করি, সুস্থ মানুষ যা পারে না অনেক ক্ষেত্রে তার থেকে তাদের অনেক ভালো প্রতিভা রয়েছে।'

সরকার অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সবরকম সুযোগ করে দিতে কাজ করে চলেছে বলেও প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন। মানসিকতা পরিবর্তন করে সবাইকে আরো সংবেদনশীল হয়ে, আরো সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের আদর-ভালোবাসা দিয়ে কাছে টেনে নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের প্রচেষ্টায় দেশে-বিদেশে অটিজম নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে বলেও অনুষ্ঠানে জানান তিনি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শক প্যানেলের সদস্য। অটিজমে আক্রান্তদের কল্যাণে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন।

তথ্য সূত্রে জানা যায়, দেশে বর্তমানে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ৫৪৩ জন। বাংলাদেশে ২০১৩ সাল থেকে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা জানতে জরিপ শুরু হয়। এখন পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, দেশে অটিস্টিকের সংখ্যা ৪৪ হাজার ৬৭৫ জন, শারীরিক প্রতিবন্ধী ৬ লাখ ৯১ হাজার ৪৮৩ জন, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ৫২ হাজার ৮৪৬ জন। এর বাইরে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ২ লাখ ১৪ হাজার ৯৫৪ জন, বাক প্রতিবন্ধী ১ লাখ ১৪ হাজার ৪৮৯ জন, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ১ লাখ ২২ হাজার ৩০৪ জন, শ্রবণ প্রতিবন্ধী ৪৫ হাজার ৬৪৬ জন, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ৬ হাজার ৯৩৫ জন।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

১০ হাজার চিকিৎসক ও ৪০ হাজার কর্মচারী নিয়োগের সিদ্ধান্ত

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ১০ হাজার চিকিৎসক ও প্রায় ৪০ হাজার কর্মচারী নিয়োগ দেবে সরকার। নতুন নিয়োগ পাওয়া চিকিৎসকদের গ্রামে রাখার জন্য প্রয়োজনে আইন করা হবে। ৪ঠা মার্চ বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) ভবনে আয়োজিত 'মিট দ্যা প্রেস' অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা জানান। বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম ও বিএমএ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো জানান, ঘাটতি কাটাতে আগামী তিন মাসের মধ্যে পাঁচ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। সরকারি হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির প্রায় ৪০ হাজার খালি পদ নির্বাচনের আগেই পূরণ করা হবে।

নতুন ডাক্তার ও নার্সদের উপজেলায় থাকতে হবে ৩ বছর

স্বাস্থ্য খাতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও নার্সদের তিন বছর অবশ্যই উপজেলায় থাকতে হবে এবং উপজেলায় থেকে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে। এর আগে বড়ো শহর বা ঢাকায় আসার কোনো তদবির করা চলবে না। ১০ই মার্চ রাজধানীর একটি হোটেলে সোসাইট অব নিউরো সার্জন আয়োজিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

বিএসএমএমইউতে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন চালু

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগে বোনম্যারো ট্রান্সপ্লানটেশন চালু হয়েছে। ১৯শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ব্লকের পনেরো তলায় এর উদ্‌বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান। এতে করে দেশে থ্যালাসেমিয়া, এপ্লাস্টিক এনিমিয়া, লিউকোমিয়া বা ব্লাড ক্যানসারসহ অন্যান্য রক্ত রোগের চিকিৎসা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হলো অটোলোগাস পদ্ধতিতে অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন করা। এ পদ্ধতিতে রোগীর নিজের সুস্থ বোনম্যারো তার নিজের শরীরে প্রতিস্থাপন করা হয়।

ওষুধ খাতে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

দেশে ওষুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত ওষুধের গুণগত মানোন্নয়ন এবং এ খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বে কাজ করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিএ) এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস (বিএসপিপি)-এর মধ্যে ১৩ই মার্চ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ওষুধ শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বাড়াতে উভয় প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর কমপক্ষে ২টি টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সার্ভিস প্রোগ্রাম (টিইসি), ন্যূনতম ২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালাসহ প্রতিবছর ২রা অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপন করবে।

বিনামূল্যে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা

দেশে সবার জন্য বিনামূল্যে অনলাইনে মানসিক সাপোর্ট ও তথ্যসেবা দেবে 'ড্রিম সাইকোলজি' নামে একটি সংগঠন। পয়লা এপ্রিল থেকে যে কেউ ফেসবুকে (www.facebook.com/dreampsychology) যোগাযোগ করে ২৪ ঘণ্টা এই সেবা পেতে পারেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ৪ঠা মার্চ ২০১৮ ঢাকায় বিএমএ ভবনের শহীদ মিলন সম্মেলনকক্ষে 'স্বাস্থ্য খাতের সাফল্য' প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরামের সাথে মিট দ্য প্রেসে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

প্রাথমিকভাবে ২৫ স্বেচ্ছাসেবককে কারিগরি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ। সাধারণ মানুষ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে এই স্বেচ্ছাসেবকেরা সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবেন।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

ডিজিটাল বাংলাদেশ

মোবাইল ইন্টারনেটে বাংলাদেশের সাফল্য

মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ১২৩টি দেশের মধ্যে ইন্টারনেটের গতি বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান ১১৫তম। এছাড়া মোবাইল ইন্টারনেটের গড় ডাউনলোড গতি ৭.৯১ মেগাবাইট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইন্টারনেট গতির এই সূচক প্রকাশ করেছে 'ওকলা' নামের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ওকলার 'স্পিডটেস্ট' ওয়েবসাইট ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেটের গতি জানার ওপর ভিত্তি করে সম্প্রতি এই সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। সূচকে বাংলাদেশের পেছনে রয়েছে বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, ইউক্রেন, নেপাল, আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, লিবিয়া, তাজিকিস্তান ও ইরাক। শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

এদিকে ফিক্সড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গতি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৬তম। বাংলাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের গড় ডাউনলোড গতি ১৬.৩১ মেগাবাইট বলে সূচকে উল্লেখ করা হয়েছে।

ম্যানিলা আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ

চলতি বছর থেকে আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে (আইআরও) অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। ১৮ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এ অলিম্পিয়াডের আয়োজক কমিটি বাংলাদেশকে সদস্য হিসেবে তাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত করেছে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের রোবটিক্স সংক্রান্ত এ অলিম্পিয়াডের আয়োজক দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াড কমিটি। বাংলাদেশের পক্ষে এ অলিম্পিয়াড আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পেয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক (বিডিওএসএন)। বিডিওএসএনের রোবট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বয়কারী রিদওয়ান ফেরদৌস গত ডিসেম্বরে চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত ১৯তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং বাংলাদেশের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন। এর পর আয়োজক কমিটির বিভিন্ন শর্ত পূরণ করার পর এ সদস্যপদ চূড়ান্ত হয়।

চলতি বছর থেকে দেশে জাতীয় ভিত্তিতে রোবট অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হবে। সেখানে বিজয়ীরা এ বছরের ডিসেম্বরে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ২০তম আন্তর্জাতিক রোবট অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

দেশে ১২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি ল্যাব গড়ে তোলা হচ্ছে

দেশের ১২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি ল্যাব গড়ে তোলার কাজ প্রায় শেষ। এ বছরেই ল্যাবগুলোতে পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু হবে। ২০১৮ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৭০ হাজারের বেশি তথ্যপ্রযুক্তিবিদ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স (এলআইসিটি) প্রকল্পের মাধ্যমে গুণগত প্রশিক্ষণে ৩৪ হাজার দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কাজ চলছে। এর আগে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ৩ হাজার ৫শ শিক্ষার্থীকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাংকও সহযোগিতা দিচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর দেশ গড়তে সরকার বদ্ধপরিকর। এই সরকারের আমলে তথ্য ও প্রযুক্তিসহ সব খাতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

ÿz`ª b„‡Mvôx: we‡kl cÖwZ‡e`

শিক্ষার উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার ফলে পার্বত্য জেলাসমূহের দুর্গম এলাকার মানুষ আজ শিক্ষার আলোতে আলোকিত। সরকার শিক্ষার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আজকের শিক্ষার্থীরা আগামীদিনে দেশ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। স্কুলে শিক্ষার্থীদের শুধু শিক্ষিত করলে হবে না, তাদের সুশিক্ষিত করতে হবে। শিক্ষার আলোতে নিজেকে আলোকিত করতে হবে। ১৬ই মার্চ বান্দরবানের বাঘমারা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ও আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী উশৈসিং।

বান্দরবানে কৃষকদের মাঝে পাওয়ার টিলার বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে ৩০শে মার্চ বান্দরবান জেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের মাঝে পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়। বান্দরবান রাজার মাঠ সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার টিলার বিতরণ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং।

এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। আর এই সরকারের আমলে কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি এলাকায় পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্পসহ কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও যেসব এলাকার জমি ধান চাষ হবে না সেসব এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে মিশ্র ফলের বাগান করে দেওয়া হচ্ছে।

বান্দরবানের রাজবিলার ১০৩তম জাদি উৎসব উদ্‌যাপন

বান্দরবান সদর উপজেলার রাজবিলার ১০৩তম উদালবনিয়ার জাদি উৎসব ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে ২ কোটি ৮ লাখ টাকা ব্যয়ে রাজবিলা রমতিয়া সড়কের ঝংকার খালের উপর আর.সি.সি গার্ডার ব্রিজের উদ্‌বোধন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আর.সি.সি গার্ডার ব্রিজের উদ্‌বোধন করেন।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ই-কৃষি সেবার নতুন দ্বার উন্মোচন

দেশব্যাপী ই-কৃষি সেবা আরো সম্প্রসারণ এবং সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং 'কৃষক বন্ধু ফোন সেবা'-এর উদ্‌বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সম্প্রতি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ সেবা দুটির উদ্‌বোধন করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সহযোগিতায় এ সেবা গড়ে তোলে।

এ সেবা দুটি ব্যবহার করে সকল ধরনের কৃষি বিষয়ক তথ্য পাওয়া যাবে। যে-কোনো সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করতে পারবেন কৃষক

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ৩৩৩১ নম্বরে ফোন করে।

অনগ্রসর কৃষকদের জন্য সাথী নামের অ্যাপস চালুর তথ্য জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মোবাইল ফোন শুধু কথা বলার জন্যই নয়; অনলাইনে এবং আমাদের স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টার ও কৃষকদের জন্য চালু করা অ্যাপ থেকে সবরকম তথ্য তারা পেতে পারেন। ফলে কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের বাজারদর জানতে পারবেন। কেউ আর তাঁদের ঠকাতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩ প্রদান

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১লা মার্চ 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে ৩২ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ পুরস্কার প্রদান করেন। পুরস্কার হিসেবে ৫টি স্বর্ণ, ৯টি রৌপ্য ও ১৮টি ব্রোঞ্জপদক দেওয়া হয়। এছাড়া পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকা করে চেকও দেওয়া হয়।

জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮-এর খসড়া প্রণয়ন

কৃষিকে বাণিজ্যিক, আধুনিক এবং খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশে ১৯৯৯ সালে জাতীয় কৃষি নীতি প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে তা আরো উন্নত ও সময়োপযোগী করার নিমিত্তে 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। এবার এটিকে আরো বেশি কার্যকর ও সময়োপযোগী করার জন্য পরিমার্জন ও সংশোধন করে 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ (খসড়া)' প্রণয়ন করা হয়েছে। ১১ই মার্চ বিএ আরসি মিলনায়তনে 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮ (খসড়া)'-এর ওপর পর্যালোচনা কর্মশালায় এসব জানান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বর্তমান সরকার। গত এক দশকে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ এবং সবজি উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মাছ আহরণের ক্ষেত্রে চতুর্থ এবং চাষের মাধ্যমে মাছ আহরণে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

কৃষিতে বিশেষ অবদান রাখায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে ১লা মার্চ ২০১৮ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৩' পদক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

৪০০ আটচল্লিশ কোটি ৩২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ১লা মার্চ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বিএসসির উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ক সভায় এসব তথ্য জানানো হয়। নৌপরিবহণ মন্ত্রী শাজাহান খান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

গাছ না কেটে যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ

দশম জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৮শে মার্চ। বৈঠকে 'যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটির কাজ গাছ না কেটে দ্রুত শুরু করতে এবং রাস্তাটি সচল রাখার স্বার্থে সংস্কারের জন্য মন্ত্রণালয়কে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবসহ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

বিএসসি বহরে এ বছর যুক্ত হবে পাঁচটি জাহাজ

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের (বিএসসি) বহরে চলতি বছরে পাঁচটি এবং ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটিসহ মোট ছয়টি বড়ো নতুন জাহাজ যুক্ত হবে। এগুলোর মধ্যে তিনটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং তিনটি বাল্ক ক্যারিয়ার। প্রতিটি জাহাজের ধারণ ক্ষমতা ৩৯,০০০ ডেড ওয়েট টন। এ বছর জুলাই ও আগস্টে দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার এবং নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তিনটি প্রোডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি বাল্ক ক্যারিয়ার চীন থেকে বাংলাদেশে এসে পৌঁছাবে। চীন সরকারের অর্থায়নে সে দেশে জাহাজগুলোর নির্মাণ কাজ চলছে। গত অক্টোবরে জাহাজের ম্যাসিভ ফেব্রিকেশন অনুষ্ঠান চীনের শিপইয়ার্ডে সম্পন্ন হয়েছে। জাহাজগুলোর মোট মূল্য এক হাজার

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জিসিএফ থেকে বাংলাদেশ পেল ৩৬০ কোটি টাকা

জাতিসংঘের সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) থেকে সাড়ে চার কোটি ডলার অনুদান পেল বাংলাদেশ, দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩৬০ কোটি টাকা। ১লা মার্চ দক্ষিণ কোরিয়ার সংদুতে জিসিএফের বোর্ড সভায় বাংলাদেশের জন্য দুটি প্রকল্পের বিপরীতে সাড়ে চার কোটি ডলার অনুদান দেওয়া হয়। এই টাকা উপকূলীয় সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার নির্বাচিত নারী ও কিশোরীদের জীবিকায়নে খরচ হবে। একই সঙ্গে ওই দুই জেলায় সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হবে।

এর আগে ২০১৫ সালে প্রথমবারের মতো জিসিএফ থেকে আট কোটি ডলার অনুদান পেয়েছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার

পরিমাণ ৬৪০ কোটি টাকা। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, জিসিএফের বোর্ড সভায় যে দুটি প্রকল্প অনুমোদন পায় তার একটি হলো আড়াই কোটি ডলার ব্যয়ে উপকূলীয় এলাকার মানুষের মধ্যে অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানো বিশেষ করে নারীদের মধ্যে প্রকল্প। জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির সহায়তা নিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় খুলনার কয়রা, দাকোপ ও পাইকগাছা এবং সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলার ৩৯ হাজার নারীর জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া একলাখ ৩০ হাজার মানুষের মধ্যে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে সে পানি সরবরাহ করা হবে। দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম পূর্বাভাসের ব্যবস্থা থাকবে এই প্রকল্পের আওতায়। অন্য প্রকল্প হলো দুই কোটি ডলার ব্যয়ে গ্লোবাল ক্লিন কুকিং প্রোগ্রাম। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৬০ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে উপকারভোগীদের কাছে চুলা দেওয়া হবে। এটি বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে বাস্তবায়িত হবে।

বিশ্ব আবহাওয়া দিবস

২৩শে মার্চ বিশ্ব আবহাওয়া দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হলো– 'জলবায়ু ঠিকঠাক : আবহাওয়া ভালো'। নানা আয়োজনে দেশব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়েছে। প্রতিরক্ষা সচিব আখতার হোসেন ভূইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে আবহাওয়া সদর দপ্তরে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করে বলেন, কৃষি ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় উন্নত আবহাওয়া ও জলবায়ু সেবা অপরিহার্য। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শনী জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক বন দিবস

পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ২১শে মার্চ রাজধানীর আগারগাঁও বন অধিদপ্তরে 'আন্তর্জাতিক বন দিবস' এবং 'বাংলাদেশের এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণে বিশেষ সেবা সপ্তাহ' উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। মন্ত্রী বলেন, উন্নত জীবনের জন্য সমৃদ্ধ নগর যেমন প্রয়োজন তেমনি সবুজ বন দেয় সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

অটিস্টিকদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ

আমরা সাভারে ২৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তুলছি। জাতীয় সংসদ প্রাঙ্গণেও তাদের খেলার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা এক লাখ ২৫ হাজার প্রতিবন্ধীকে ভাতা দিচ্ছি। প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের দেশে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন লোকদের জন্য প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। সূচনা ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশনও করে দিয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো- প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। ২রা এপ্রিল ঢাকায় একাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন।

মুক্তিযোদ্ধাদের পাঁচটি বোনাস দেওয়ার আশ্বাস

বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করেছে। আগামীতে মুক্তিযোদ্ধাদের পাঁচটি বোনাস দেওয়া হবে। বর্তমানে দুটি বোনাস দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কক্সবাজারে এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এ কথাগুলো বলেন।

তিনি আরো বলেন, ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং পহেলা বৈশাখেও মুক্তিযোদ্ধাদের বোনাস দেওয়া হবে। তিনি বলেন, বছরের প্রথম দিন ছাত্রদের হাতে বই তুলে দিয়েছে সরকার। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন ঘটনা। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযোদ্ধাদের গর্বিত সাফল্যের কথার পাশাপাশি চিহ্নিত রাজাকারদের কুকীর্তির কথাও থাকবে। ফলে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও ধারণা পাবে শিক্ষার্থীরা।

১০ টাকা দরে চাল দিচ্ছে সরকার

১লা মার্চ থেকে সারাদেশে ১০ টাকা কেজি দরে চাল দিচ্ছে সরকার। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে প্রতি কেজি ১০ টাকা দরে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির জন্য বছরে ৭ লাখ ৫০ হাজার মে. টন চাল দরকার হয়। পিআইডির এক তথ্যবিবরণীতে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

এছাড়া ৪ঠা মার্চ থেকে সারাদেশে ওএমএস-এর মাধ্যমে স্বল্প দামে চাল বিক্রি শুরু করেছে খাদ্য অধিদপ্তর। প্রতি ডিলার ১ টন করে চাল বরাদ্দ পাচ্ছেন। একজন ব্যক্তি সর্বাধিক ৫ কেজি চাল ক্রয় করতে পারছেন। প্রতি কেজি চালের দাম ধরা হয়েছে ৩০ টাকা। এছাড়া ইতোমধ্যে ওএমএস-এ ১৭ টাকা দরে আটা বিক্রি করছে খাদ্য অধিদপ্তর।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

মোবাইল অ্যাপভিত্তিক রাইড শেয়ারিং নীতিমালা চালু

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে ৮ই মার্চ থেকে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭ কার্যকরের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। ১৫ই জানুয়ারি রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাইড শেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা ২০১৭-এর গেজেট প্রকাশ করা হয়। উবার, পাঠওসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মোবাইল অ্যাপভিত্তিক এ সেবা দিয়ে আসছে। সেবাটি একটি নিয়মের মধ্যে আনতে ১১টি শর্ত নিয়ে একটি নীতিমালা তৈরি করে সরকার।

নীতিমালাগুলো হলো–

১. রাইড শেয়ারিং পরিচালনার জন্য বিআরটিএর কাছ থেকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি এনলিস্টমেন্ট সনদ নিতে হবে। মোটরযানের মালিকদের এ সনদ গ্রহণ করতে হবে।

২. রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের টিআইএন ও ভ্যাট নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে। তবে কোম্পানি হলে প্রাইভেট-পাবলিক কোম্পানির শর্তাবলি মেনে চলতে হবে।

৩. যাত্রী চাহিদা, সড়ক নেটওয়ার্কের ক্যাপাসিটি, রাইডিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ইত্যাদি বিআরটিএ থেকে নির্ধারণ করা হবে। রাইড শেয়ারিং সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস এলাকায় অফিস থাকতে হবে।

৪. কোনো রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সেবার সঙ্গে যুক্ত হতে বিআরটিএ থেকে নির্ধারিত সংখ্যক মোটরযান নিয়োজিত করতে হবে। ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসি) অনুমোদিত এলাকার জন্য কমপক্ষে ১০০টি, চট্টগ্রাম মহানগরীর জন্য ৫০টি, দেশের অন্যান্য মহানগর এলাকার জন্য কমপক্ষে ২০টি বাহন থাকতে হবে।

৫. রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের আওতায় ব্যক্তিগত মোটরযান যেমন– মোটর সাইকেল, মোটরকার, জিপ, মাইক্রোবাস, অ্যাম্বুলেন্স অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৬. রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন– নিবন্ধন সনদ, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, ইনস্যুরেন্স, এনলিস্টমেন্ট সনদ হালনাগাদ থাকতে হবে।

৭. রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সনদপ্রাপ্তির পর রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, মোটরযানের মালিক ও চালকের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি করতে হবে। সেখানে সবপক্ষের অধিকার এবং দায়-দায়িত্বের বিষয় উল্লেখ থাকবে।

৮. মোটরযান মালিক বা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এক মাস আগে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে চুক্তির সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারবে।

৯. নির্ধারিত স্ট্যান্ড, অনুমোদিত পার্কিং স্থান ব্যতীত কোনো রাইড শেয়ারিং মোটরযান যাত্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যেখানে সেখানে অপেক্ষমান থাকতে পারবে না।

১০. নীতিমালার অধীন একজন মোটরযান মালিক মাত্র একটি মোটরযান রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের আওতায় পরিচালনার অনুমতি পাবেন।

১১. ব্যক্তিগত মোটরযান নিবন্ধনের পর ন্যূনতম এক বছর অতিক্রম না হলে রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের আওতায় পরিচালনার অনুমতি পাবেন না।

১২. বিআরটিএর ওয়েব পোর্টালে রাইড শেয়ারিং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর আওতাধীন সব মোটরযানের তালিকা শ্রেণিবদ্ধভাবে একটি মেন্যুতে রাখতে হবে। এতে যাত্রীর অভিযোগ জানানোর সুযোগ রাখতে হবে।

প্রতিবেদন : মো. সৈয়দ হোসেন

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশব্যাপী তথ্য অফিসের মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদক গ্রহণ মানুষের মস্তিষ্ক, শ্বাসযন্ত্র, রক্তপ্রবাহ, স্নায়ুতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, প্রজননতন্ত্র, জৈব রাসায়নিক ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এতে শরীরের স্বাভাবিক পুষ্টি, সৌন্দর্য ও গঠন বিনষ্ট হয়। মাদক সমস্যা কেবল জাতীয় সংকটকেই ঘনীভূত করছে না, তা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ মাদকাসক্তি। মাদক প্রতিরোধে সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তি, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের নিরলস, বহুমুখী ও সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের জেলা তথ্য অফিসসমূহের মাধ্যমে ১লা মার্চ দেশব্যাপী মাদকবিরোধী বিশেষ প্রচারাভিযান উপলক্ষে ঢাকা জেলা তথ্য অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়। গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের এই মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান সারাদেশে বেশ সাড়া জাগিয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১লা মার্চ ২০১৮ জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে জেলা তথ্য অফিস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আয়োজিত মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন তৎকালীন ঢাকা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন–পিআইডি

ঢাকা জেলা তথ্য অফিস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলার যৌথ উদ্যোগে ঢাকা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে মাদক ও জঙ্গিবাদবিরোধী সেমিনার

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত 'মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী কর্মকাণ্ডে যুবদের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনার ঢাকায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যুবদের সার্বিক কল্যাণার্থে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এর আলোকে বর্তমানে অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এই অ্যাকশন প্ল্যানে মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী কার্যক্রমে যুবদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করার বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ সহায়তা প্রদানে তাদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া তালিকাভুক্ত ১৮ হাজারের অধিক যুব সংগঠনের অংশগ্রহণে জেলা-উপজেলায় জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম ও মাদকের অপব্যবহার রোধে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন: আসাব আহমেদ

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশু উন্নয়নে ২৭০০ কোটি টাকা দেবে ইউনিসেফ

বাংলাদেশের শিশু উন্নয়ন ও বিকাশে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা দেবে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক তহবিল ইউনিসেফ। সরকার চার বছর মেয়াদি একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ ৩৪ কোটি ডলার অর্থ অনুদান হিসেবে পাবে।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে ১১ই মার্চ এ বিষয়ে ইউনিসেফের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি অ্যাডওয়ার্ড বেগবেদার এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব কাজী শফিকুল আযম চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯শে মার্চ ২০১৮ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ভারতের Ganges Art Gallery PVT LTD-এর উদ্যোগে চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দীনের 'শান্তি' শীর্ষক একক চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন–পিআইডি

এই অর্থ দিয়ে চার বছরের যে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। তার আওতায় শিশুর জন্মনিবন্ধন, শৈশবকালীন বিকাশ রুদ্ধ হওয়ার ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সহিংসতা প্রতিরোধ, কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম, বাল্যবিয়ে রোধ, শিশু কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।

পাহাড়ি শিশুরা পাবে শিক্ষার আলো

দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তিন পার্বত্য জেলা– রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পৌনে ২ লাখ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশনসহ অন্যান্য সুবিধার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা' শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ৪০৫ কোটি টাকার এ প্রকল্পে লক্ষাধিক পাহাড়ি শিশু শিক্ষার সুযোগ পাবে। এ প্রকল্পের আওতায় তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার ১২১টি ইউনিয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে এ এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক সেবার সুযোগ বৃদ্ধি, সবার জন্য শিক্ষা, মা ও শিশুর উন্নয়ন, শিশুদের জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন বিষয় যেমন– স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ৮০ হাজার পরিবারের ন্যূনতম মৌলিক সুবিধা প্রদান। এসব পরিবারের স্কুল গমনোপযোগী ১ লাখ ৭ হাজার ৫০০ শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হবে। এছাড়া এসব পরিবারের শিশু, কিশোরী ও মহিলাদের পুষ্টি ঘাটতি হ্রাসকরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, পার্বত্য এলাকার ৪ হাজার ৫০০ পাড়াকেন্দ্র উন্নয়ন ও পাড়াকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

স্বাধীনতা দিবসে এগিয়ে যাওয়ার শপথ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার দৃপ্ত শপথে জাতি ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করে। একই সঙ্গে বিনম্র শ্রদ্ধা আর গভীর কৃতজ্ঞতায় একাত্তরের বীর শহিদদের স্মরণ করেছে সর্বস্তরের মানুষ। স্বাধীনতা দিবসের বিকেলে এক উৎসবমুখর পরিবেশে সেজেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। সেখানে সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'বিজয় নিশান উড়ছে ঐ'।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গাওয়া জাতীয় সংগীত দিয়ে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিবেশনার আগে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, এ ময়দানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু মুক্তি ও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। দেশ এখন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের পথে আমাদের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে। এটাই হবে এবারের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রত্যয়।

শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে ১৯শে মার্চ শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের মাসব্যাপী একক চিত্র প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায়

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং ভারতের কলকাতার গ্যাঞ্জেস আর্ট গ্যালারি 'শান্তি' শীর্ষক এই চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি সচিব ইব্রাহীম হোসাইন খান। অনুষ্ঠানে শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী ও গ্যাঞ্জেস আর্ট গ্যালারির পরিচালক স্মিতা বাজোরিয়া বক্তৃতা করেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদের লেখা 'আমার মুক্তিযুদ্ধ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

বিশ্ব নাট্য দিবসের বর্ণাঢ্য উদ্‌যাপন

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২৭শে মার্চ 'বিশ্ব নাট্য দিবস' উদ্‌যাপন করেন ঢাকার নাট্যজনেরা। এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা, প্রীতি সম্মিলনী, স্মারক বক্তৃতা ও সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাওয়ায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরকে।

শিল্পকলা একাডেমিতে দিনব্যাপী বিশ্ব নাট্য দিবসের কর্মসূচির আয়োজন করে যৌথভাবে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই) বাংলাদেশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন ও বাংলাদেশে পথনাটক পরিষদ।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ

বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। দেশের রপ্তানির প্রায় ৮১ ভাগ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে। জিডিপিতে এ সেক্টরের অবদান প্রায় ১৩ ভাগ। এ শিল্পে জনবল নিয়োজিত আছে প্রায় ৫০ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ৮০ ভাগই নারী। দেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোকে অত্যাধুনিক করে গড়ে তোলা হয়েছে। ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল স্বীকৃত ৬৭টি গ্রিন ফ্যাক্টরি রয়েছে, নিবন্ধিত রয়েছে আরো ২০টি। এবার ইউএস গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিল যে ১০টি ফ্যাক্টরিকে এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন (এলইইডি) সার্টিফিকেট দিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের রয়েছে ৭টি। এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখলকারী প্রতিষ্ঠান তিনটিও বাংলাদেশের। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এখন শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে '৯ম আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপো অ্যান্ড ডায়ালগ ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন করেন

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ৮ই মার্চ হংকং-এর হোটেল শেরাটন এইচকেতে প্রাইম সোর্স ফোরাম আয়োজিত দুদিনব্যাপী ১৩তম প্রাইম সোর্স ফোরামে 'দ্য গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইকোনমিক অপরচুনিটিস ফর বাংলাদেশ' শীর্ষক কী নোট উপস্থাপনের সময় এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় স্থান। বাংলাদেশে এখন চমৎকার বিনিয়োগের পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিগত যে-কোনো সময়ের চেয়ে ভালো। বাংলাদেশ সরকার বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। বিনিয়োগকারীরা এখন শতভাগ বিনিয়োগ করতে পারবেন। প্রয়োজনে বিনিয়োগকৃত শতভাগ অর্থ এবং লাভ ফিরিয়ে নিতে পারবেন।

কুইক রেন্টালের ফলে গড়ে উঠেছে আলোকিত বাংলাদেশ

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বর্তমানে দেশে সাড়ে ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। কুইক রেন্টালের ফলে আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। পরিবেশবান্ধব সবুজ শিল্পায়ন বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। জিরো পলিউশন ও জিরো এক্সিডেন্ট নীতির ভিত্তিতে সরকার শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিল্পকারখানার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

শিল্পমন্ত্রী ১লা মার্চ বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে '৯ম আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনোভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এক্সপো অ্যান্ড ডায়ালগ ২০১৮'-এর উদ্‌বোধনকালে এসব কথা বলেন।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

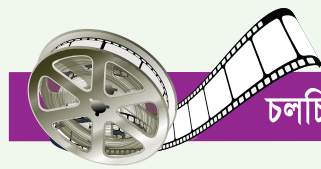

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি উদ্যোগে সিনেমা হলের আধুনিকায়ন

সরকারি উদ্যোগে সিনেমা হল আধুনিকায়ন করতে ৫০ কোটি টাকা বাজেটকে সামনে রেখে সিনেমা হলে ডিজিটাল প্রযুক্তি স্থাপনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন হচ্ছে। ১৭ই মার্চ এফডিসিতে এ বিষয়ে 'সিনেমা হলে ডিজিটাল প্রদর্শন সিস্টেম প্রবর্তন' শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ বিষয়ে একটি প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে 'এ' ক্যাটাগরিতে ২০টি ও 'বি' ক্যাটাগরিতে ৪০টি সিনেমা হলকে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ৩রা এপ্রিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৭ সালের এই দিনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন তথা আজকের 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন বিল' উত্থাপন করেন। এর ফলে চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল দল

২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই বিশেষ দিনটিকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

জার্মানির ফিল্ম ফেস্টে 'আ পেয়ার অব স্যান্ডেল' প্রদর্শিত

জার্মানির ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেইজ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্ট নির্মাতা জসীম আহমেদের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'আ পেয়ার অব স্যান্ডেল' বেস্ট শর্ট ফিল্ম ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ১৮-২২শে এপ্রিল জার্মানির কালমরুহি শহরে অনুষ্ঠিত হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ উৎসব ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেইজ ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টের ২০তম আসর। এ উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলোর দৈর্ঘ্য ৫ মিনিট। বাংলাদেশের ছবি 'আ পেয়ার অব স্যান্ডেল' ছবিটির কাহিনি হচ্ছে– রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে। এতে টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন স্থানে পানি, খাবার ও আশ্রয়ের অভাবে তৈরি হওয়া মানবিক বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে।

এ উৎসবের ১১টি ক্যাটাগরিতে বিশ্বের ৪৬টি দেশের ১৫০টি ছবি প্রতিযোগিতা করেছে। ইংরেজি ভাষায় এই চলচ্চিত্রটির স্ক্রিপ্ট লিখেছেন ফরিদ আহমেদ ও আবহসংগীত করেছেন রিপন নাথ।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে বাংলাদেশ

নিদাহাস ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে সাব্বির রহমানের ৫০ বলে ৭৭ রানের জের ধরে বাংলাদেশের দলীয় স্কোর দাঁড়ায় ৬ উইকেটে ১৬৬ রান। ব্যাটিং পিচে এই পুঁজি নিয়েও শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করতে পারায় সন্তুষ্ট বিসিবি প্রধান নাজমুল হাসান পাপন। তিনি বলেন– 'আমাদের দলের সেরা চার ব্যাটসম্যান ফাইনালে রান করতে পারেনি, তারপরও এই পুঁজি নিয়ে আমরা যেভাবে লড়েছি এটা প্রশংসার দাবি রাখে এবং শেষ বল পর্যন্ত আমরা লড়াই করেছি। আমি সেইজন্য বলবো তারা হয়ত কষ্ট দিয়েছে, হতাশ করেছে। কিন্তু তারা বীরের মতো লড়াই করেছে। সেই কারণে আমি তাদের উপর খুশি'।

দক্ষিণ এশীয় আর্চারিতে বাংলাদেশের দাপট

বিকেএসপি থেকে দারুণ সুখবর দিয়েছেন বাংলাদেশের আর্চাররা। দক্ষিণ এশীয় আর্চারিতে গত ২৭শে মার্চ দলীয় ও ব্যক্তিগত ইভেন্ট মিলিয়ে দেশের জন্য পাঁচটি সোনার পদক জিতেছেন তাঁরা। রিকার্ভ পুরুষ ইভেন্টে সোনা জিতেছেন বাংলাদেশের ইব্রাহিম শেখ রেজওয়ান।

রিকার্ভ মিশ্রে ভারতের প্রতিযোগীকে হারিয়ে সোনা নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশের নাসরিন আকতার ও রোমান সানা।

দলগত মিশ্র কম্পাউন্ডে সোনা জিতেছেন বাংলাদেশের অসীম কুমার ও বন্যা আকতার। তাঁরা হারিয়েছেন ভারতের প্রতিযোগীদের। পুরুষদের দলগত কম্পাউন্ড ইভেন্টেও সোনা বাংলাদেশের। এই দলে ছিলেন এ কে এম মামুন, অসীম কুমার ও আশিকুজ্জামান অনয়।

যুব ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব-১৫ নারী দল

চার জাতি আন্তর্জাতিক নারী যুব ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল দল। বাংলাদেশের মেয়েরা ১লা এপ্রিল তাদের তৃতীয় ও শেষ খেলায় স্বাগতিক হংকংকে ৬-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর আগে তারা মালয়েশিয়াকে ১০-১ গোলে এবং ইরানকে ৮-০ গোলে পরাজিত করে। অর্থাৎ চার জাতি এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ অপরাজিত থাকে।

এ আসরে তিন খেলায় পূর্ণ নয় পয়েন্ট ও সর্বোচ্চ ২৪ গোল বাংলাদেশের। বিদেশের মাটিতে এটি অনূর্ধ্ব-১৫ দলের দ্বিতীয় শিরোপা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজংগী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এসকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।